সিলেবাস

বাংলা দ্বিতীয় পত্র (আবশ্যিক)
বিষয় কোড: ০০২
পূর্ণমান- ১০০

বিষয়	পূর্ণমান
▸ অনুবাদ (ইংরেজি থেকে বাংলা)	১৫
▸ কাল্পনিক সংলাপ	১৫
▸ পত্রলিখন	১৫
▸ গ্রন্থ-সমালোচনা	১৫
▸ রচনা	৪০

সূচিপত্র

ক্র. নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
i	অনুবাদ (ইংরেজি থেকে বাংলা)	০১
ii	কাল্পনিক সংলাপ	৩০
iii	পত্রলিখন	৫৪
	গ্রন্থ-সমালোচনা	
	মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গ্রন্থের সমালোচনা	
০১	রাইফেল, রোটি, আওরাত	১০৬
০২	জাহান্নম হইতে বিদায়	১০৮
০৩	পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়	১০৯
০৪	একাত্তরের দিনগুলি	১১১
০৫	আমি বিজয় দেখেছি	১১২
০৬	মূলধারা'৭১	১১৪
০৭	আমি বীরাঙ্গনা বলছি	১১৫
০৮	জোছনা ও জননীর গল্প	১১৬
	ভাষা আন্দোলনভিত্তিক গ্রন্থের সমালোচনা	
০৯	আরেক ফাল্গুন	১১৮
১০	কবর	১১৯
	সামাজিক সমস্যা সম্পর্কিত গ্রন্থের সমালোচনা	
১১	পদ্মা নদীর মাঝি	১২০
১২	পথের পাঁচালী	১২২
১৩	হাজার বছর ধরে	১২৩
১৪	তিতাস একটি নদীর নাম	১২৪
১৫	লালসালু	১২৬
১৬	সূর্যদীঘল বাড়ী	১২৭
১৭	মৃত্যুক্ষুধা	১২৯
	৬৯'র গণঅভ্যুত্থানের উপর গ্রন্থ-সমালোচনা	
১৮	চিলেকোঠার সেপাই	১৩০

ক্র. নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
	বাঙালির ইতিহাস ও ঐতিহ্য বিষয়ক গ্রন্থের সমালোচনা	
১৯	বাঙ্গালীর ইতিহাস	১৩২
২০	বাঙালি ও বাঙলা সাহিত্য	১৩৩
	ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনীতি বিষয়ক গ্রন্থের সমালোচনা	
২১	আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর	১৩৫
	রোমান্টিক/কাব্যধর্মী গ্রন্থের সমালোচনা	
২২	শেষের কবিতা	১৩৬
	অসাম্প্রদায়িক বা বিদ্রোহী চেতনার পটভূমিতে রচিত গ্রন্থের সমালোচনা	
২৩	অগ্নি-বীণা	১৩৮
	ট্রাজেডি বা বিয়োগান্ত বিষয়ক গ্রন্থের সমালোচনা	
২৪	কৃষ্ণকুমারী	১৪০
	প্রজাশোষণ সম্পর্কিত গ্রন্থের সমালোচনা	
২৫	নীলদর্পণ	১৪১
২৬	জমিদার দর্পণ	১৪৩
	মনস্তত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থের সমালোচনা	
২৭	চোখের বালি	১৪৪
	মহাকাব্য/পুরাণ আখ্যান বিষয়ক গ্রন্থের সমালোচনা	
২৮	মেঘনাদবধ কাব্য	১৪৬
	ভ্রমণকাহিনি বিষয়ক গ্রন্থের সমালোচনা	
২৯	দেশে বিদেশে	১৪৭
	লোক ঐতিহ্য/কাহিনি কাব্যের সমালোচনা	
৩০	নক্সী কাঁথার মাঠ	১৪৯
৩১	মৈমনসিংহ গীতিকা	১৫০
	অর্থনীতি বিষয়ক গ্রন্থের সমালোচনা	
৩২	দারিদ্র্যের অর্থনীতি	১৫১

সূচিপত্র

ক্র. নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
	রচনা/প্রবন্ধ	
	সাম্প্রতিক বিষয়াবলি	
০১	ডলার সংকট: বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট, কারণ ও উত্তরণের উপায়	১৫৫
০২	বৈশ্বিক জ্বালানি সংকট ও বাংলাদেশের চ্যালেঞ্জ	১৬০
০৩	চতুর্থ শিল্প বিপ্লব: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ	১৬৫
০৪	রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ ও বাংলাদেশে এ যুদ্ধের প্রভাব	১৬৯
০৫	এলডিসি থেকে বাংলাদেশের উত্তরণ	১৭২
০৬	অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ	১৭৬
০৭	সুনীল অর্থনীতির বিশ্ব পরিস্থিতি: বাংলাদেশের সম্ভাবনা ও অগ্রগতি	১৮২
	উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক বিষয়াবলি	
০৮	শ্রম অভিবাসন: সমস্যা ও সম্ভাবনা	১৮৫
০৯	বাংলাদেশের কৃষির যান্ত্রিকীকরণ	১৮৯
১০	দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও তার প্রতিকার	১৯২
১১	বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও পর্যটনস্থান	১৯৫
১২	বাংলাদেশের পোশাক শিল্পে বৈদেশিক বিনিয়োগ: সংকট ও সম্ভাবনা	১৯৮
১৩	বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প: সমস্যা ও সম্ভাবনা	২০২
১৪	বাংলাদেশের চামড়া শিল্প: সম্ভাবনা, সমস্যা ও সমাধান	২০৬
১৫	নারীর ক্ষমতায়ন ও বাংলাদেশ	২১০
১৬	জনশক্তি রপ্তানি ও প্রবাসী আয়	২১৪
১৭	দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি অথবা দারিদ্র্য বিমোচন	২১৮
১৮	বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প: সমস্যা ও করণীয়	২২১
	পরিবেশ বিষয়ক	
১৯	বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তন ও বাংলাদেশ	২২৫

ক্র. নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
২০	বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও তার প্রতিকার	২৩০
	সামাজিক সমস্যামূলক সমস্যাবলি	
২১	সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ও যুবসমাজ	২৩৪
	তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক	
২২	সাইবার অপরাধ	২৩৭
২৩	ই গর্ভনেন্স: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ	২৪১
২৪	ইন্টারনেট সংস্কৃতি ও বিশ্বব্যবস্থা	২৪৬
	ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক	
২৫	জাতীয় উন্নয়নে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা	২৪৯
২৬	বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম	২৫৩
	রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক বিষয়াবলি	
২৭	গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও স্বাধীন গণমাধ্যম	২৫৮
২৮	সুশাসন: বাংলাদেশ প্রেক্ষিত/আইনের শাসন ও বাংলাদেশ	২৬২
	বাংলাদেশের প্রাচীন ঐতিহ্য,সংস্কৃতি, শিক্ষা ও সাহিত্য	
২৯	আধুনিক বাংলা সাহিত্যে তারুণ্য	২৬৬
৩০	বাঙালির ঐতিহ্য ও কৃষ্টি	২৬৯
৩১	স্বদেশপ্রেম/দেশাত্মবোধ	২৭৩
৩২	সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও বাংলাদেশ	২৭৬
৩৩	বিশ্বায়ন ও আমাদের সংস্কৃতি/সাংস্কৃতিক আগ্রাসন	২৭৯
৩৪	কর্মমুখী শিক্ষা/বৃত্তিমূলক শিক্ষা/কারিগরি শিক্ষা	২৮২
	বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট	
৩৫	আগামীর পৃথিবী ও আমাদের প্রত্যাশা	২৮৬
iv	মডেল টেস্ট (১-২)	২৯০

কাল্পনিক সংলাপ

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন

০১. বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার সমস্যা নিয়ে দুজন শিক্ষকের মধ্যে কাল্পনিক সংলাপ তৈরি করুন। [৪৭তম বিসিএস (সাধারণ)]

০২. ২০২৪ সালের জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পরিপ্রেক্ষিতে দেয়ালে আঁকা গ্রাফিতি, চিত্র ও লেখা নিয়ে পিতা ও কন্যার মধ্যে কাল্পনিক সংলাপ তৈরি করুন। [৪৬তম বিসিএস (সাধারণ)]

০৩. 'সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বাংলা ভাষার অপপ্রয়োগ' বিষয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর একটি কাল্পনিক সংলাপ রচনা করুন। [৪৫তম বিসিএস (সাধারণ)]

০৪. করোনাকালে শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষতি প্রসঙ্গে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যকার একটি কাল্পনিক সংলাপ রচনা করুন। [৪৪তম বিসিএস]

০৫. ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের ফলে টালমাটাল বিশ্ব-অর্থনীতির মন্দার শিকার একজন বাংলাদেশি শ্রমিকের সঙ্গে একজন অর্থনীতিবিদের কাল্পনিক সংলাপ রচনা করুন। [৪৩তম বিসিএস]

০৬. বাঙালির স্বাধীনতা আন্দোলনে ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের গুরুত্ব সম্পর্কে ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে একটি কাল্পনিক কথোপকথন বা সংলাপ রচনা করুন। [৪১তম বিসিএস]

০৭. পড়াশোনা শেষ করে চাকরি গ্রহণ এবং স্ব-উদ্যোগে গৃহীত কোনো কাজের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহকরণ সম্পর্কে দুই বন্ধুর মধ্যে একটি সংলাপ রচনা করুন। [৪০তম বিসিএস]

০৮. বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রবীণ শিক্ষক এবং অধ্যয়নরত একজন তরুণ শিক্ষার্থীর মধ্যে শিক্ষার অতীত ও বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে একটি কাল্পনিক সংলাপ রচনা করুন। [৩৮তম বিসিএস]

০৯. বিদেশে পড়াশুনা করে প্রবাসজীবন নির্বাচন এবং বাংলাদেশে লেখাপড়া করে স্বদেশেই অবস্থান করা সম্পর্কে দুই বন্ধুর কথোপকথন বা সংলাপ লিখুন। [৩৭তম বিসিএস]

১০. একজন প্রবীণ মুক্তিযোদ্ধা এবং স্বাধীনতা-পরবর্তী প্রজন্মের এক তরুণের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে সংলাপ লিখুন। [৩৬তম বিসিএস]

১১. ১০ বছরের একটি ছেলে হারিয়ে গেছে। ছেলেটির মা-বাবা গেছেন থানায়। পুলিশ মামলা নিতে চাইছে না। ছেলেটির মা-বাবা এবং একজন পুলিশ কর্মকর্তার চরিত্র অবলম্বন করে এই পরিস্থিতির উপযুক্ত সংলাপ রচনা করুন। [৩৫তম বিসিএস]

সংলাপ পরিচিতি

'সংলাপ' একটি পারিভাষিক শব্দ। ইংরেজি 'Dialogue' কিংবা 'Conversation' শব্দদ্বয়ের বাংলা পরিভাষা হচ্ছে 'সংলাপ' কিংবা 'কথোপকথন'। সাধারণভাবে, সংলাপ হচ্ছে কোনো বিষয়ের ওপরে দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে কথোপকথন বা দুটো দলের মতবিনিময়। এছাড়া সাহিত্যে বিশেষত নাটকে বা উপন্যাসে এক ধরনের সংলাপ রয়েছে। সেই সংলাপ আবার নাটকের বা উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী রচিত হয়। **তবে কাল্পনিক সংলাপ বলতে বোঝায় এমন ধরনের সংলাপকে, যা কোনো বিষয়ে ব্যক্তির কল্পনায় তৈরি হয়। অর্থাৎ কাল্পনিক সংলাপ হচ্ছে "A conversation created and held in one person's imagination".** কেননা সংলাপের মৌলিক দিকগুলোর অন্যতম একটি হচ্ছে, সমাজ-বাস্তবতায় গণমানুষের কল্যাণের দিক। কাল্পনিক সংলাপ কল্পিত বিষয় হলেও তাতে মানুষের কল্যাণচিন্তা থাকে, ইতিহাস থাকে, ঐতিহ্য বা সংস্কৃতি থাকে, ধর্ম থাকে, সামগ্রিক জীবনবোধের পরিচয় থাকে। আবার এগুলো গঠনের বা সংরক্ষণের অন্তরায়গুলোর উপস্থিতিও থাকতে পারে। যা থেকে আমরা শিক্ষা নিয়ে আমাদের চিন্তাকে, ভালো-মন্দ বিবেচনাকে, বোধ-বুদ্ধিকে শাণিত করতে পারি। কাল্পনিক সংলাপ বাস্তবে ঘটনা ঘটার আগে মনোজগতে তৈরি হতে থাকে। একে বলা যেতে পারে পূর্বপ্রস্তুতিমূলক সংলাপ বিন্যাস। এ জাতীয় সংলাপে ব্যক্তি নিজেই যৌক্তিক প্রশ্ন তৈরি করেন এবং তার সদুত্তর প্রদানের চেষ্টা করেন।

সংলাপ লেখার পূর্বে যে বিষয়গুলো মাথায় রাখতে হবে:

১. সংলাপের ভাষা হবে স্পষ্ট, সহজ-সরল, প্রাঞ্জল এবং সাবলীল।
২. সংলাপের একটি চরিত্রের সম্পর্কে তার নৈতিকতা, শিক্ষার মান, সামাজিক বৈশিষ্ট্য, বয়স, লিঙ্গ, ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি যেন তার সংলাপের মাধ্যমে বুঝা যায়। মনে রাখতে হবে ছেলে মানুষের মুখে বুড়োর কথা যেমন বেমানান, তেমনি বুড়োর মুখে ছেলেমানুষি কথা হাস্যকর।
৩. ভূমিকামূলক আলোচনা দীর্ঘ না করে দ্রুত মূল আলোচনায় যেতে হবে।
৪. সংলাপের বাক্য ছোট হলেই ভালো। বড় বড় জটিল বাক্য কিংবা অতিকথন সংলাপকে ক্লান্তিকর করে।
৫. প্রশ্নে উল্লেখ না থাকলে চরিত্রের নাম না দেওয়াই ভালো। যেমন: রহিম, করিম না লিখে বন্ধু-১, বন্ধু-২ লেখা ভালো।
৬. চরিত্রের পরে, সংলাপের আগে কোলন চিহ্ন দিতে হয়। প্রতিটি সংলাপের কোলন চিহ্নগুলো এক বরাবর থাকবে। যেমন:

বন্ধু ১: .....
.....

বন্ধু ২: .....
.....

কাল্পনিক সংলাপ লেখার নিয়ম:

১. প্রথমে প্রশ্ন অনুসারে একটি শিরোনাম তৈরি করে নিতে হবে। যেমন: 'দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি নিয়ে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে সংলাপ' শিরোনামের নিচে দাগ দিতে পারেন।
২. এরপর সংলাপের স্থান ও সময় উল্লেখ করবেন। এটি সাধারণত প্রশ্নে দেওয়া থাকে না। তাছাড়া স্থান ও সময়ের নিচে তৃতীয় বন্ধনীতে একটি পরিপ্রেক্ষিত তৈরি করে নিবেন। যেমন: স্থান : একটি বাজার। সময় : ছুটির দিন। সকাল দশটা। [এক কেজি ডাল কেনার পর দাম দিতে গিয়ে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে কথোপকথন]।
৩. কথা বলার সময় আমাদের নানা রকম অভিব্যক্তি হয়। সংলাপ রচনার সময় প্রথম বন্ধনীতে অভিব্যক্তি দিতে হবে। যেমন: (হেসে), (দীর্ঘশ্বাস ফেলে), (রেগে গিয়ে) ইত্যাদি। এ রকম অন্তত চারটি অথবা পাঁচটি অভিব্যক্তি একটি সংলাপে দিবেন।
৪. চরিত্রের নড়াচড়া ও আগমন-প্রস্থান তৃতীয় বন্ধনীতে দেখাতে হবে। যেমন: [বিক্রেতা আরেকটি প্যাকেটে আলু ভরতে লাগল]
৫. সংলাপ কার কার মধ্যে হবে, সেটি প্রশ্নে নির্দিষ্ট করে দেওয়া থাকে। তবে উত্তর করার সময় তৃতীয় আরেকটি চরিত্র তৈরি করে নিলে ভালো হবে। যেমন: ক্রেতা-বিক্রেতার সংলাপে আরেকজন ক্রেতাকে ঘটনার মধ্যে আনা যায়। তৃতীয় চরিত্রের সংলাপ মাত্র একটি দিতে হবে। সে মোটেই মুখ্য ভূমিকা পালন করবে না। তার আগমন ও প্রস্থান তৃতীয় বন্ধনীতে দেখাতে হবে।
৬. সংলাপে আঞ্চলিকতা পরিহার করতে হবে। তবে দরিদ্র কৃষক, রিকশাওয়ালা ইত্যাদি চরিত্রের সংলাপ লেখার সময়ে ক্রিয়াপদ ও দু একটি শব্দে সামান্য আঞ্চলিকতা রাখবেন।
৭. সংলাপের শুরু শেষ বলে কিছু নেই। শুরুটা কোথা থেকে হচ্ছে সেটা শুরুর পরিপ্রেক্ষিতে লিখে দিলেই হয়। শুভেচ্ছা বা সালাম বিনিময়ের মাধ্যমে যে শুরু করতে হবে, এমন নয়। আবার শেষ করার ক্ষেত্রে সময়ের দিকে তাকিয়ে কাজ করতে হবে। সময় শেষ হয়ে গেলে এভাবে লিখতে হবে: [এরপর দুজনের মধ্যে আরও কিছুক্ষণ কথা চলল এবং ক্রেতা গজগজ করতে করতে চলে গেলেন]
৮. একটি বা দুটি সংলাপ একটু দীর্ঘ হবে, যেখানে কিছু তথ্য থাকবে।
৯. কখনো কখনো চরিত্র মনে মনে কথা বলে। এ রকম সংলাপকে বলা হয় স্বগতোক্তি। সংলাপ রচনার সময়ে একটি স্বগতোক্তি দিতে হবে।

[রেফারেন্স: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষক তারিক মনজুর এর লেখা, প্রথম আলো থেকে সংগৃহীত]

দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য

১. লেখার পূর্বে অবশ্যই নিয়মগুলো একবার দেখে নিবেন।
২. ১৫ মার্কসের জন্য ২০-২৫ মিনিটে ৩.৫-৪.৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমালোচনা লেখা শেষ করবেন। [উল্লেখ্য ১৫ মার্কসের জন্য সময় পাবেন ১৮ মিনিট কিন্তু গ্রন্থ সমালোচনা ভালোভাবে শেষ করতে ১৫ মার্কসের অন্য প্রশ্ন থেকে একটু বেশি লেখার প্রয়োজন পড়ে। তাই অনুবাদ, কাল্পনিক সংলাপ এবং পত্র এই বিষয়গুলো ১৫ মিনিটের মধ্যে লেখার চেষ্টা করবেন। এখান থেকে সময় বাঁচিয়ে গ্রন্থ সমালোচনা এবং প্রবন্ধ অংশ ভালোভাবে লেখার চেষ্টা করবেন।]

নমুনা সংলাপ

০১। বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার সমস্যা নিয়ে দুজন শিক্ষকের মধ্যে কাল্পনিক সংলাপ তৈরি করুন। [৪৭তম বিসিএস (সাধারণ)]

উত্তর:

শিরোনাম: বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার সংকট

স্থান	:	টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা	সময়	:	দুপুর ২টা ৩০ মিনিট

পাত্র:

১) নিলয় আহমেদ-সিনিয়র শিক্ষক (শিক্ষক-১)

২) আতিক হাসান-সিনিয়র শিক্ষক (শিক্ষক-২)

[দুইজন সম্মানিত শিক্ষক কর্তৃক বাংলাদেশের চলমান শিক্ষাব্যবস্থার বহুমাত্রিক সমস্যা নিয়ে কাল্পনিক সংলাপ]

শিক্ষক-১ : সম্মানিত স্যার, আজকের শিক্ষক মিটিংয়ে আলোচনার বিষয়গুলো শুনে সত্যিই চিন্তায় পড়ে গেলাম! শিক্ষাব্যবস্থার সমস্যাগুলো যেন দিনকে দিন আরও প্রকট হয়ে উঠছে।

শিক্ষক-২ : ঠিকই বলেছেন, স্যার। বিশেষকরে স্কুলগুলোতে শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত এখন ভয়ানকভাবে অসম। একটি ক্লাসে ৬৫-৭০ জন শিক্ষার্থী নিয়ে মানসম্মত ক্লাস নেওয়া আসলেই কঠিন।

শিক্ষক-১ : **(দীর্ঘশ্বাস ফেলে)** তার ওপর অবকাঠামোগত সংকট তো রয়েছেই। অনেক স্কুলেই পর্যাপ্ত শ্রেণিকক্ষ, বিজ্ঞানাগার, কম্পিউটার ল্যাব-কিছুই নেই। শিক্ষার্থীরা কেবল তাত্ত্বিক জ্ঞান পাচ্ছে, হাতে-কলমে কিছু শেখার সুযোগ নেই।

শিক্ষক-২ : **(চিন্তাশীল ভঙ্গিতে)** আরেকটি বড় সমস্যা হলো শিক্ষকদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের অভাব। অনেকে এখনো চৌকস ক্লাস ব্যবস্থাপনা কৌশল ও আধুনিক মূল্যায়ন পদ্ধতির সঠিক প্রয়োগ জানেন না।

শিক্ষক-১ : দেখুন স্যার, বাংলাদেশের সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ৬৪ শতাংশ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত প্রযুক্তিগত অবকাঠামো নেই, ৪৮ শতাংশ শিক্ষক ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি বা ব্যবহার করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন না, এবং গ্রামীণ অঞ্চলে অনেক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে এখনও ইন্টারনেট সুবিধা অনিয়মিত। এমতাবস্থায় প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষা তো দূরের কথা, সাধারণ মাল্টিমিডিয়া ক্লাস নিতেও সমস্যা হয়। আবার পাঠ্য বইয়ের আধুনিকায়ন হলেও শিক্ষকরা সেগুলো কার্যকরভাবে প্রয়োগ করার প্রশিক্ষণ পাননি। ফলে বই ও বাস্তবতা-দুটোর মাঝে একটি বড় ব্যবধান তৈরি হয়েছে।

শিক্ষক-২ : একদম সত্যি। আর অভিভাবকের চাপ তো আছেই। তারা শুধু ফলাফল দেখে, শেখা বা দক্ষতা অর্জনকে গুরুত্ব দেয় না। এতে শিক্ষার্থীদের ওপর মানসিক চাপ ভয়াবহভাবে বাড়ছে।

শিক্ষক-১ : পরীক্ষাকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থাই এর অন্যতম কারণ। আমরা এখনো মুখস্থনির্ভর মূল্যায়ন থেকে বের হতে পারিনি।

শিক্ষক-২ : গবেষণা বলছে, বাংলাদেশে মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের প্রায় ৫৫ শতাংশ বুঝে পড়তে পারে না, ৪২ শতাংশ সাধারণ বিশ্লেষণধর্মী প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না। অথচ পরীক্ষায় নম্বর ভালো আসে শুধু মুখস্থ উত্তর লিখে। অর্থাৎ শেখার ফল বা লার্নিং আউটকাম দুর্বল, কিন্তু পরীক্ষার নম্বর দেখে মনে হয় সব ঠিক আছে। এই বৈপরীত্যই সবচেয়ে বড় সমস্যা।

শিক্ষক-১ : তাই তো বলি স্যার, পাঠ্যক্রমে দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা নিয়ে যত কথা হচ্ছে, প্রয়োগে ততটা অগ্রগতি নেই।

শিক্ষক-২ : **[মনে মনে বির বির করে বলতে লাগলেন...]** শিক্ষক স্বল্পতাও বড় একটি চ্যালেঞ্জ। অনেক প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন পদ শূন্য রয়েছে বছরের পর বছর ধরে। একজন শিক্ষককে তিন থেকে চারটি বিষয় পড়াতে হয়।

শিক্ষক-১ : তার ওপর আরেকটি বিষয় আছে–ব্যবস্থাপনাগত সমস্যা। স্থানীয় পর্যায়ের প্রশাসনিক জটিলতা, দীর্ঘসূত্রতা, বাজেট বণ্টনে বৈষম্য–এসবও শিক্ষার মানকে প্রতিনিয়ত ক্ষতিগ্রস্ত করছে। বিশেষ করে বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার উন্নয়নে যে পরিমাণ বিনিয়োগ থাকা উচিত, বাস্তবে তার অর্ধেকও নেই।

শিক্ষক-২ : আপনি ঠিকই বলেছেন। বিশেষ করে গ্রামে মানসম্মত শিক্ষক ধরে রাখা কঠিন। কর্মপরিবেশ, সুযোগ-সুবিধা, প্রশিক্ষণ–এসবই সীমিত।

শিক্ষক-১ : ভাবতে অবাক লাগে–অর্থনৈতিক উন্নয়ন যতই হোক, শিক্ষাক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন যেন ধীরগতিরই রয়ে গেছে। (একটু থেমে) অথচ শিক্ষাই তো উন্নয়নের ভিত্তি।

[এই সময় শিক্ষার্থী শামীম প্রবেশ করে–হালকা দ্বিধাগ্রস্ত ভঙ্গিতে দাঁড়ায়]

শামীম : [স্যার, বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত। জানতে চাচ্ছিলাম, গণিত অলিম্পিয়াডের রেজিস্ট্রেশন ফর্মগুলো কি আগামীকাল জমা দিতে হবে?]

শিক্ষক-২ : হ্যাঁ শামীম, কাল দুপুরের মধ্যেই দিয়ে দেবে। এখন তুমি ক্লাসে ফিরে যাও।

[ধন্যবাদ স্যার বলে শামীম ক্লাসের দিকে যেতে লাগলো...]

শিক্ষক-১ : দেখলেন তো স্যার? আগ্রহী শিক্ষার্থী আছে, সুযোগ দিলে তারা অনেক দূর যেতে পারবে। কিন্তু, উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি না হলে তাদের সম্ভাবনা বিকশিত হয় না।

শিক্ষক-২ : স্যার, কারিকুলাম সংস্কার খুব জরুরি হয়ে গেছে। শুধু পাঠ্যবই নয়-শিক্ষা পদ্ধতি, মূল্যায়ন, প্রশিক্ষণ সবকিছু যুগোপযোগী করতে হবে।

শিক্ষক-১ : বিশ্বের যে দেশগুলো শিক্ষায় এগিয়ে যেমন-ফিনল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া–তারা শেখায় সহযোগী পরিবেশ, কম চাপ, দক্ষতাভিত্তিক শিখন এবং প্রযুক্তি নির্ভর শ্রেণিকক্ষ। কিন্তু আমাদের এখানে অনেক জায়গায় এখনো চক-ডাস্টার ক্লাস, পুরনো মূল্যায়ন পদ্ধতি আর বছরের পর বছর একই পড়ানোর ধরনই চলছে। আমাদেরও চাই বাস্তবমুখী শিক্ষা, সমস্যা সমাধান, সৃজনশীল চিন্তা, দলগত কাজ, লাইফ স্কিল–এসবই ভবিষ্যতের দক্ষতা।

শিক্ষক-২ : সত্যি বলতে কী, একটি নীতি বদলালে হবে না বরং একটি সমন্বিত জাতীয় শিক্ষা সংস্কার প্রয়োজন।

শিক্ষক-১ : শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও প্রণোদনা বাড়ানো গেলে পরিস্থিতি অনেক বদলাবে। শিক্ষকই শিক্ষার আসল চালিকাশক্তি।

শিক্ষক-২ : আর স্কুলে প্রযুক্তি ব্যবহারের দক্ষতা বাড়ানো গেলে শিক্ষার্থীরাও শিখতে আগ্রহী হবে। মাল্টিমিডিয়া, স্মার্ট ক্লাস প্রভৃতি বর্তমান প্রজন্মের শিক্ষা গ্রহণের পদ্ধতিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়া জরুরি।

শিক্ষক-১ : আমাদের পাঠ্যবইগুলোতেও বাস্তব উদাহরণ ও জীবনঘনিষ্ঠ বিষয়গুলো বাড়াতে হবে। এতে ছাত্র-ছাত্রী শেখাকে নিজেদের জীবনের সাথে মিলিয়ে নিতে পারবে।

শিক্ষক-২ : (চিন্তামগ্ন হয়ে) স্যার, সব সমস্যার সমাধান হয়তো একদিনে হবে না; কিন্তু আমাদের শিক্ষক হিসেবে সচেতন থাকা, পরিবর্তনের চেষ্টা করা–এটাই সবচেয়ে বড় দায়িত্ব।

শিক্ষক-১ : ঠিক বলেছেন স্যার। তাহলে আসুন–আগামী সপ্তাহ থেকে আমরা নিজের ক্লাসগুলোতেই ছোট ছোট পরিবর্তন শুরু করি। এটা থেকেই বড় পরিবর্তনের পথ তৈরি হবে।

[এরপর উভয় শিক্ষকই নিজ নিজ ক্লাস নেওয়ার উদ্দেশ্যে শ্রেণিকক্ষের দিকে রওনা হলেন...]

০২। ২০২৪ সালের জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পরিপ্রেক্ষিতে দেয়ালে আঁকা গ্রাফিতি, চিত্র ও লেখা নিয়ে পিতা ও কন্যার মধ্যে কাল্পনিক সংলাপ তৈরি করুন। [৪৬তম বিসিএস (সাধারণ)]

উত্তর:

[এক বিকালে পিতা (বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক, গণতন্ত্রপন্থী চিন্তাশীল নাগরিক) ও তার কন্যা (নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী, কৌতূহলী ও সচেতন) দুইজন ঢাকার একটি প্রধান সড়কের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। প্রধান সড়কের পাশের দেয়ালে ২০২৪ সালের জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পর শিক্ষার্থীদের আঁকা ছবি দেখে দেয়ালচিত্র নিয়ে কথোপকথন হয়।] তাদের মধ্যকার সংলাপটি নিম্নে দেওয়া হলো:

স্থান	:	ঢাকার একটি প্রধান সড়কের পাশের দেয়াল	সময়	:	বিকাল ৫:০০টা

কন্যা : (দেয়ালের দিকে তাকিয়ে) আব্বু, এই দেয়ালটা কত বিচিত্র! দেখো, এখানে কারো মুখ কাপড়ে ঢাকা, চোখে আগুন। নিচে লেখা- "দমন নয়, দাবি মানো!"

পিতা : হ্যাঁ মা, এটা ২০২৪ সালের জুলাইয়ের গণ-অভ্যুত্থানের সময়কার গ্রাফিতি। এই আন্দোলন ছিল অন্যায়, দুর্নীতি ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে একটা বড় বিস্ফোরণ।

কন্যা : তুমি কি তখন রাস্তায় গিয়েছিলে?

পিতা : আমি রাস্তায় নামিনি, তবে শিক্ষার্থী আর তরুণদের অনেককেই উদ্বুদ্ধ করেছিলাম। ২০২৪ সালে যখন দ্রব্যমূল্য আকাশছোঁয়া, দুর্নীতি সর্বত্র এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতা হুমকির মুখে, তখন সাধারণ মানুষ আর তরুণরাই রাস্তায় নামে।

কন্যা : কিন্তু দেয়ালে আঁকা কেন? মানুষ তো শুধু স্লোগান দিলেই পারত।

পিতা : দেয়ালই তখন সাধারণ মানুষের কণ্ঠ হয়ে উঠেছিল। মিডিয়া অনেকটাই নিয়ন্ত্রিত ছিল। তাই দেয়ালচিত্র, স্টেনসিল আর গ্রাফিতির মাধ্যমে প্রতিবাদ ছড়িয়ে পড়ে।
দেয়াল লিখনগুলোতে যেমন ছিল-
- "রুটি, কাপড়, ন্যায় চাই"
- "জনতার সরকার চাই"
- "রাষ্ট্র নয়, মানুষ আগে"

এসব ছিল নিপীড়নের বিরুদ্ধে এক নীরব চিৎকার।

কন্যা : (চোখে বিস্ময় নিয়ে) এই ছবিটা দেখো, একটি হাত শিকল ছিঁড়ে স্বাধীনতার প্রতীক জাতীয় পতাকা উড়াচ্ছে।

পিতা : এটি প্রতীকী ছবি। শাসনযন্ত্র যখন জনগণের কণ্ঠ রুদ্ধ করতে চায়, তখন এইরকম শিল্পই প্রতিবাদের হাতিয়ার হয়। ওই সময় অনেক শিল্পী গোপনে এসব আঁকতেন-রাতে বেরিয়ে পড়তেন দেয়ালে তুলির আঁচড় দিতে।

কন্যা : এত সাহস! কেউ ধরেনি?

পিতা : অনেকে ধরা পড়েছে। কেউ কেউ কারাবরণ করেছে, আবার কেউ পলাতক থেকেছে। কিন্তু ইতিহাস বলে, প্রতিটি গণ-অভ্যুত্থানেই এমন কিছু নায়ক থাকেন যাদের নাম হয়তো বইয়ে লেখা হয় না, কিন্তু দেয়ালে লেখা থেকে মুছে যায় না।

কন্যা : (একটি দেয়ালচিত্রের দিকে ইঙ্গিত করে) আব্বু, এই যে পেছনে নারী-পুরুষ, শ্রমিক-সবাই একসাথে মিছিল করছে এটা কী বোঝায়?

পিতা : এটা বোঝায় জাতীয় ঐক্য। জুলাইয়ের সেই আন্দোলনে রাজনৈতিক দলের গণ্ডি পেরিয়ে, ধর্ম-বর্ণ ভুলে মানুষ একত্র হয়েছিল। সেই ঐক্যই ছিল এই দেশের গণতন্ত্রের পুনর্জাগরণের ভিত্তি।

কন্যা : তাহলে এই দেয়ালগুলো কি আমরা ইতিহাস বইয়ের মতো গুরুত্ব দিয়ে দেখব?

পিতা : একদম! দেয়ালচিত্র হচ্ছে গণমানুষের অনুভবের প্রকাশ। এটা 'জনগণের ইতিহাস', যেখানে বইয়ের ইতিহাস কখনও পক্ষপাতদুষ্ট হতে পারে, দেয়ালের ইতিহাস থাকে অন্তরের ভাষায় লেখা।

কন্যা : আমি চাই এসব ছবিগুলো সংরক্ষণ করা হোক।

পিতা : অনেকেই এখন এসব গ্রাফিতি ডিজিটালভাবে সংরক্ষণ করছে। কিছু বিশ্ববিদ্যালয় আর নাগরিক সংগঠন এগিয়ে এসেছে। কিন্তু সবচেয়ে বড় সংরক্ষণ হবে, যদি তোমরা নতুন প্রজন্ম, এসবের পেছনের গল্প জানো, বুঝো আর ভুলে না যাও।

কন্যা : আব্বু, আমি ভাবছি স্কুলে এই বিষয়টা নিয়ে একটা প্রজেক্ট করব। হয়তো দেয়ালচিত্রগুলোর ছবি তুলে তাদের ব্যাখ্যা করব।

পিতা : অসাধারণ ভাবনা মা। এমন চিন্তাই জাতিকে সচেতন করে। তুমি যদি এসব শিখো, জানো, তাহলে আর কেউ তোমার অধিকার কেড়ে নিতে পারবে না। চল মা, আজকে চলে যাই। অনেক দেরি হয়ে গেছে।

[দুইজন এক সাথে রিকশায় উঠে চলে গেলো]

০৩। 'সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বাংলা ভাষার অপপ্রয়োগ' বিষয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর একটি কাল্পনিক সংলাপ রচনা করুন।

[৪৫তম বিসিএস (সাধারণ)]

উত্তর:

['সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বাংলা ভাষার অপপ্রয়োগ' বিষয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে সংলাপ]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষক ড. মুস্তাকিম ও শিক্ষার্থী শিশির এর মধ্যে "সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বাংলা ভাষার অপপ্রয়োগ" নিয়ে একটি কাল্পনিক সংলাপ:

স্থান	:	কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার	সময়	:	বিকাল ৪:৩০ টা

শিশির : (উৎফুল্ল হয়ে) আসসালামু আলাইকুম স্যার। কেমন আছেন?

ড. মুস্তাকিম : (অবাক হয়ে) ওয়ালাইকুম আসসালাম। আমি ভালো আছি।

শিশির : স্যার, আজ তো শহিদ দিবস, সকালে শহিদ মিনার জনাকীর্ণ থাকায় ভিড় ঠেলে আসতে পারিনি, তাই সুযোগ পেয়ে বিকাল বেলায় চলে আসলাম।

ড. মুস্তাকিম : (উচ্ছ্বসিত হয়ে) খুব ভালো লাগলো শুনে। ভাষার জন্য যারা নিজের তাজা রক্তে রাজপথ রঞ্জিত করেছিল তাঁদের অবদান জাতি আজ ভুলতে বসেছে। সেখানে তোমার মতো একজন তরুণের মনের মণিকোঠায় শহিদদের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা আমাকে পুলকিত করেছে ।

শিশির : স্যার, এটা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব।

ড. মুস্তাকিম : (বিস্মিত হয়ে) কিন্তু কেউ কী তা মনে রাখে? যত্রতত্র বাংলা ভাষার অপপ্রয়োগ হচ্ছে।

শিশির : (ব্যথিত হয়ে) বিশেষ করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যেন বাংলা ভাষার ভুল প্রয়োগের হিড়িক পড়ে গিয়েছে।

ড. মুস্তাকিম : (বিস্মিত হয়ে) ঠিক বলেছো। পাশাপাশি বাংলার ভুল বানান, যতিচিহ্নের যাচ্ছেতাই ব্যবহার যেন রফিক, শফিক, বরকতের আত্মদানের ইতিহাসকে তিরস্কার জানাচ্ছে। [হঠাৎ তৃতীয় ব্যক্তি প্রবেশ করে]

রফিক : [স্যার, আমিও এমন লিখতাম। এখন বুঝি, অভ্যাসের নাম করে আমরা ভাষাটাকেই বিকৃত করছি।]

ড. মুস্তাকিম : ঠিক তাই, সচেতন হলেই অভ্যাস বদলানো সম্ভব। [তৃতীয় ব্যক্তির প্রস্থান]

শিশির : হ্যাঁ স্যার, এই অপপ্রয়োগ এড়ানোর জন্য চাই দেশপ্রেম আর সদিচ্ছা।

ড. মুস্তাকিম : সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে বাংলার যে বিকৃত রূপ চোখে পড়ছে, তা যেন বাংলা ভাষার লেখ্যরূপের নির্ঘাত অপমৃত্যু; তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

শিশির : স্যার, আমরা 'বাংলিশ' নামে ইংরেজি অক্ষরে বাংলা ভাষাকে উপস্থাপন করছি; যা বাংলা ভাষার লেখ্যরূপের জন্য হুমকি।

ড. মুস্তাকিম : বাংলা ভাষাকে রক্ষাকারী হিসেবে লেখক সমাজকে অগ্রগণ্য মনে করা হয়। কিন্তু বর্তমানে কিছু তথাকথিত লেখক যারা বিভিন্ন উদ্ভট, বিতর্কিত বিষয়ে বই লিখে পাঠকদের আকৃষ্ট করছে। এসব বইয়ের বাংলিশ নামকরণ, বাংলা, হিন্দি, ইংরেজি মিশ্রিত লেখনিতে বাংলা ভাষা অবমূল্যায়িত হচ্ছে।

শিশির : স্যার, এসব বই যারা পড়ছে তারা পাঠক নয়। মূলত সেলিব্রিটিদের সাথে ছবি তোলা এবং অটোগ্রাফ নেওয়াই এদের প্রধান লক্ষ্য।

ড. মুস্তাকিম : কোন আইন প্রয়োগ করে এই অপপ্রয়োগ দূর করা অত্যন্ত দুরূহ হবে বলে মনে করি। শিক্ষক থেকে শুরু করে যদি আপামর জনতা সবাই যোগাযোগ মাধ্যমে বাংলা ভাষার ব্যবহারের সময় সতর্কতা অবলম্বন করি তবে এই অপপ্রয়োগ বন্ধ করা সম্ভব।

শিশির : ঠিক বলেছেন স্যার, আমাদের সামান্য সচেতনতাই শহিদদের আত্মোৎসর্গ সফল করে তুলতে পারে।

ড. মুস্তাকিম : ছাত্র বয়সেই তোমার এত সুন্দর উপলব্ধি দেখে শিক্ষক হিসেবে আমি খুবই আনন্দিত। আজকে ২১ ফেব্রুয়ারি উপলক্ষ্যে বাংলা একাডেমি আয়োজিত একটি সেমিনারে আমি প্রধান অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত হয়েছি। তাই এখনই আমাকে যেতে হবে। বাংলা ভাষার অপপ্রয়োগ দূর করার বিষয়ে আগামীকাল তোমাদের সাথে আলাপ হবে। ভালো থেকো, আল্লাহ হাফেজ।

শিশির : জ্বি স্যার, আগামীকাল তাহলে বিস্তারিত আলোচনা হবে। আল্লাহ হাফেজ, স্যার।

০৪। করোনাকালে শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষতি প্রসঙ্গে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যকার একটি কাল্পনিক সংলাপ রচনা করুন। [৪৪তম বিসিএস]

উত্তর:

[মো: আল আমিন হোসেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইকোলজি বিভাগের ১ম বর্ষের ছাত্র এবং একই বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক ড. আনু মুহাম্মদ। দুইজন তাদের ক্যাম্পাস থেকে বাসে করে ঢাকায় যাচ্ছিলেন, এমন সময় তাদের দেখা হয় এবং করোনাকালে শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষতি প্রসঙ্গে তাদের মধ্যে কথোপকথন হয়।] তাদের মধ্যকার সংলাপটি নিম্নে দেওয়া হলো:

স্থান	:	বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস	সময়	:	বিকাল ৫.০০ টা

ছাত্র : (বিনম্র স্বরে) আসসালামু আলাইকুম, স্যার। কেমন আছেন স্যার?

শিক্ষক : (খুশি খুশি গলায়) ওয়ালাইকুম আসসালাম, ভালো আছি। তুমি কেমন আছো?

ছাত্র : ভালো আছি, স্যার। স্যার, করোনাকালে আমরা শিক্ষাক্ষেত্রে বেশ পিছিয়ে পড়লাম।

শিক্ষক : (মাথা নেড়ে) হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছো। করোনার কারণে আমাদের অনেক ছেলেমেয়ে স্কুল থেকে ঝরে পড়েছে।

ছাত্র : স্যার আজ UNICEF ও UNESCO প্রকাশিত এশিয়ার শিক্ষাখাতের ওপর কোভিড-১৯ এর প্রভাব ও মোকাবেলা কার্যক্রম বিষয়ক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ (মিটএন) রিপোর্ট শীর্ষক প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয়েছে। এতে বলা হচ্ছে, ২০২০ সালের প্রথম দিকে কোভিড-১৯ মহামারি শুরুর পর থেকে স্কুল বন্ধ থাকায় বাংলাদেশে ৩ কোটি ৭০ লাখ শিশুর এবং দক্ষিণ এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও পূর্ব এশিয়াসহ এশিয়ার প্রায় ৮০ কোটি শিশুর পড়াশোনা ব্যাহত হয়েছে।

শিক্ষক : (গম্ভীর স্বরে) আসলে প্রতিবেদনটি সঠিক। তুমি তোমার এলাকার কথা চিন্তা কর যে, করোনাকালে অনেক শিশু দিনমজুর হয়েছে, বাল্যবিবাহ হয়েছে এবং অনেকে হতাশাগ্রস্ত হয়েছে।

ছাত্র : কিছু দেশ যেমন: ফিলিপাইনের মহামারির পুরো সময়ে স্কুলগুলো বন্ধ রাখা হয়, যা এখনও বহাল আছে এবং যে কারণে প্রাক-প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক পর্যায়ের ২ কোটি ৭০ লাখ শিক্ষার্থীর সশরীরে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। বাংলাদেশ গত ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২২ স্কুলগুলো পুনরায় খুলে দেওয়ার আগ পর্যন্ত মহামারির পুরোটা সময় স্কুলগুলো বন্ধ ছিল।

শিক্ষক : অবশ্যই এভাবে ক্রমাগত স্কুল বন্ধ থাকার সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়গুলির পরিণতি অত্যন্ত গুরুতর, যার মধ্যে রয়েছে পড়াশোনার ক্ষতি, মানসিক দুর্দশা, স্কুলের খাবার ও নিয়মিত টিকা না পাওয়া কাঠামোগত শিক্ষা থেকে ঝরে পড়ার ঝুঁকি বৃদ্ধি, শিশুশ্রম এবং বাল্যবিবাহ বৃদ্ধি। এই ভয়াবহ পরিণতিগুলোর মধ্যে অনেকগুলো ইতোমধ্যে অসংখ্য শিশুকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে এবং অনেকগুলো আগামী বছরগুলোতেও অনুভূত হতে থাকবে।

ছাত্র : তাহলে এই যে, শিক্ষাব্যবস্থায় করোনার কারণে এতবড় ক্ষতি হলো তা থেকে পরিত্রাণের উপায় কী হতে পারে?

শিক্ষক : হ্যাঁ একটা বিষয় হতে পারে যে অনলাইনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ক্লাসের ব্যবস্থা করা।

ছাত্র : কিন্তু, ক্যাম্পেইন ফর পপুলার এডুকেশন (সিএএমপিই) পরিচালিত এক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, বাংলাদেশ মহামারির কারণে স্কুল বন্ধ থাকার সময় প্রাক-প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের প্রতি তিনজন শিক্ষার্থীর দূরশিক্ষণ সেবা পৌঁছানো যায়নি।

শিক্ষক : হ্যাঁ, অবশ্যই। কারণ বস্তুগত সম্পদ ও সহায়তার অভাব ছাড়াও এই কঠিন সময়ে সুবিধাবঞ্চিত শিশু এবং অনেক কন্যাশিশুর দূরশিক্ষণ পদ্ধতিতে শিক্ষা গ্রহণে উল্লেখযোগ্য আরো যেসব বিষয় প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়িয়েছে তার মধ্যে রয়েছে শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশের অভাব, গৃহস্থালির কাজ করার চাপ বৃদ্ধি এবং বাড়ির বাইরে কাজ করতে বাধ্য হওয়া।

ছাত্র-২ : [আসসালামু আলাইকুম স্যার। গত ক্লাসের লেকচারের পর আমার কিছু জিজ্ঞাসা ছিল। যদি আপনার সময় হয় তাহলে কী জিজ্ঞেস করবো স্যার?]

শিক্ষক : এখন নয়। আগামী ক্লাস শুরুর পূর্বে যোগাযোগ করবে। [ছাত্র-২ এর প্রস্থান]

ছাত্র : এখন সময় এসেছে এ সংকট কাটিয়ে ওঠার।

শিক্ষক : দ্রুতই এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে হবে। সংকট কাটিয়ে উঠতে দ্রুত পদক্ষেপ না নেওয়া হলে, এশিয়া অঞ্চলে ১.২৩ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনৈতিক ক্ষতি হবে।

ছাত্র : (উদ্বিগ্ন প্রকাশ) স্যার, তাহলে বাংলাদেশ কী করতে পারে?

শিক্ষক : প্রথমত যেহেতু করোনার প্রকোপ আর নাই সেহেতু স্কুল-কলেজ খুলে দিতে হবে। তারপর স্কুল-কলেজে সঠিক স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিত করতে হবে। মাস্ক পরে শিক্ষার্থীরা প্রতিষ্ঠানে যাবে এবং সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার ব্যবস্থা থাকতে হবে। এক বেঞ্চে দুইজন করে বসতে পারে। এভাবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে স্কুল-কলেজ খোলা উচিত। তাহলে আমরা ক্ষতি পুষিয়ে উঠতে পারবো।

ছাত্র : ধন্যবাদ স্যার আপনাকে।

শিক্ষক : ঠিক আছে, তোমাকেও ধন্যবাদ।

০৫। ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের ফলে টালমাটাল বিশ্ব-অর্থনীতির মন্দার শিকার একজন বাংলাদেশি শ্রমিকের সঙ্গে একজন অর্থনীতিবিদের কাল্পনিক সংলাপ রচনা করুন। [৪৩তম বিসিএস]

উত্তর:

[ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের ফলে টালমাটাল বিশ্ব অর্থনীতির মন্দার শিকার একজন বাংলাদেশি শ্রমিক ও একজন অর্থনীতিবিদের মধ্যে সংলাপ]

স্থান	:	অর্থনীতিবিদের বাসার গ্যারেজ	সময়	:	সকাল ১০.০০ টা

অর্থনীতিবিদ : আহা, ঝুড়িটা এইখানে না ঐখানে রাখ।

শ্রমিক : আসসালামু আলাইকুম স্যার, কেমন আছেন?

অর্থনীতিবিদ : (অবাক হয়ে) ওয়ালাইকুম আসসালাম, ভালো আছি। ওহ তুমি, এখানে কবে থেকে?

শ্রমিক : এই তো স্যার, গত মাসে এসেছি। কী করব স্যার বলেন, পরিবার নিয়ে এখন টিকে থাকাটাই দায় হইয়া গ্যাছে, আমাদের মতোন শ্রমিকরা কই যাইবো স্যার? তাই এইখানে আরেকটু রোজগারের আশায় আইছি।

অর্থনীতিবিদ : ভালো। এখন তো ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের কারণে সারাবিশ্বে অর্থনৈতিক মন্দাভাব চলছে। ফলে এর প্রভাব বাংলাদেশেও পড়েছে।

শ্রমিক : স্যার এতকিছু মাথায় ঢোকে না। বাজারে আগুন লাগছে স্যার। চারডা ডাল ভাত খাওনের জন্য বাজার করতেও পকেট খালি হইয়া যায়।

অর্থনীতিবিদ : হ্যাঁ, মুদ্রাস্ফীতির ফলে প্রায় সব নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশ্ব বাজারে ভোজ্য ও জ্বালানি তেল এবং খাদ্যশস্যের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় আমদানি খরচও বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে সব কিছুর দাম উর্ধ্বমুখী।

শ্রমিক : আমরা তো এতো কিছু বুঝি না স্যার। আমরা একটু ভালোভাবে খাইয়া পইরা বাঁচতে পারলেই হলো। আমাদের সরকার তো পারে আমাদের কমদামে চাল-ডাল-তেল দিতে। আপনেরা শিক্ষিত মানুষ সরকারের কাছে বলেন না ক্যান স্যার? নাকি ওনারা চান আমরা না খাইয়া মরি।

অর্থনীতিবিদ : (হেসে বললো) না, না, কী বল এগুলো? আসলে তোমাকে কেমন করে বোঝাই? এটা আসলে বৈশ্বিক সমস্যা। তারপরও অর্থনীতিবিদগণ সরকারকে নানা রকম পরামর্শ প্রদান করছে। সরকার সেইভাবে কাজও করছে।

শ্রমিক : (অবাক হয়ে) তাহলে আমরা ফল পাইতেছি না ক্যান?

অর্থনীতিবিদ : সব কিছুই তো তাড়াতাড়ি হয় না। একটু ধৈর্য ধরতে হবে।

শ্রমিক : এখন তাহলে আমরা কী করব স্যার?

ড্রাইভার : [স্যার, গাড়ির জন্য তেল কী পেট্রোল পাম্প থেকে ওহন নিয়া আমু নাকি যাওনের সময় নিমু?]

অর্থনীতিবিদ : আমরা এখনই বের হবো। যাওয়ার সময় পাম্প থেকে তেল নিবো। [ড্রাইভারের প্রস্থান]

অর্থনীতিবিদ : শোন, এখন অপ্রয়োজনীয় খরচগুলো বাদ দিবা। আর সরকার স্বল্পমূল্যে ওএমএস কার্যক্রম চালাচ্ছে। সেখান থেকেও কমমূল্যে প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করবা। আর গ্রামে কোনো কৃষি জমি থাকলে ফেলে না রেখে কৃষিকাজে লাগিয়ে দিবা। তাহলে তোমার উপর কিছুটা চাপ কমবে।

শ্রমিক : অনেক ধন্যবাদ স্যার। আপনের কথাগুলো কাজে লাগানোর চেষ্টা করমু। ভালো থাইকেন স্যার।

অর্থনীতিবিদ : তুমিও ভালো থেকো। খোদা হাফেজ।

শ্রমিক : খোদা হাফেজ।

০৬। বাঙালির স্বাধীনতা আন্দোলনে ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের গুরুত্ব সম্পর্কে ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে একটি কাল্পনিক কথোপকথন বা সংলাপ রচনা করুন। [৪১তম বিসিএস]

উত্তর:

[বাঙালির স্বাধীনতা আন্দোলনে ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের গুরুত্ব সম্পর্কে ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে একটি কাল্পনিক সংলাপ]

স্থান	:	বিদ্যালয় মাঠ	সময়	:	বিকাল ৫.০০ টা

ছাত্র : (বিনম্র স্বরে) স্যার, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন, স্যার?

শিক্ষক : ওয়ালাইকুম আসসালাম। হ্যাঁ, ভালো আছি। তুমি কেমন আছো? লেখাপড়া কেমন চলছে?

ছাত্র : (হাসি মুখে) ভালো আছি স্যার। লেখাপড়া মোটামুটি ভালো চলছে।

শিক্ষক : (গম্ভীর কণ্ঠে) জানো, আজ আমরা সকলেই স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারছি কিন্তু পৃথিবীর এখনো অনেক স্থান আছে যেখানে মানুষ স্বাধীন ভাবে চলাফেরা করতে পারে না।

ছাত্র : হ্যাঁ, স্যার। আপনি ঠিক বলেছেন। স্যার, স্বাধীনতা অর্জনের জন্য কিছু প্রভাবক কাজ করে থাকে।

শিক্ষক : তুমি ঠিক বলেছো। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পিছনে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা রয়েছে। তন্মধ্যে ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান হলো অন্যতম।

ছাত্র : স্যার, কীভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের পিছনে ঊনসত্তরের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ?

শিক্ষক : তাহলে শোনো। কোনো দেশ তার স্বাধীনতা অর্জনের জন্য অনেকগুলো কারণ অন্বেষণ করে থাকে। আর বাঙালি জাতি অর্থাৎ বাংলাদেশের জনগণ নানাভাবে পশ্চিম পাকিস্তান সরকার কর্তৃক নির্যাতনের ও শোষণের শিকার হচ্ছিল। আর এরই ধারাবাহিকতায় তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রতিবাদ ও আন্দোলন করেছিল।

ছাত্র : স্যার, পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকবর্গ কী পূর্ব পাকিস্তানি জনগণকে নানাভাবে শোষণ ও দমন নিপীড়ন চালিয়েছিল। আর শেখ মুজিবুর রহমানের নামে মিথ্যা মামলা দায়ের করে। এটা ছিল তাদের ষড়যন্ত্র।

শিক্ষক : (মাথা নেড়ে) হ্যাঁ, তুমি ঠিক ধরেছো। পূর্ব পাকিস্তানি জনগণকে রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতা শূন্য করার জন্য শেখ মুজিবুর রহমানসহ ৩৫ জন পূর্ব পাকিস্তানি বিখ্যাত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করে। মূলত এ মামলা ছিল প্রহসনমূলক ও বাঙালি নেতাদের রাজনৈতিকভাবে হয়রানি মূলক।

ছাত্র : স্যার, তৎকালীন বাঙালি জাতির মনিকোঠায় আসন পাওয়া আকাশচুম্বী জনপ্রিয় নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে পশ্চিম পাকিস্তানি সরকার কোনোভাবে হেনস্তা করতে চাইলে পূর্ব পাকিস্তানিরা অর্থাৎ বাঙালিরা কোনোভাবেই তা মেনে নিতেন না। তাই না স্যার?

শিক্ষক : হ্যাঁ, একদম ঠিক বলেছো। ১৯৬৮ সালের ১৭ জুন 'আগরতলার ষড়যন্ত্র মামলা'-এর জন্য শেখ মুজিবকে জেল গেট থেকে গ্রেফতার করা হয় তখন পূর্ব বাংলার সকল রাজনৈতিক ছাত্র সংগঠন তাঁর মুক্তির দাবিতে আন্দোলন পরিচালনা করে। **যেমন:** পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন 'মেনন ও মতিয়া', জাতীয় ছাত্র ফেডারেশন।

ছাত্র : স্যার, এই চরম আন্দোলনের মুখে পশ্চিম পাকিস্তানের সরকার পূর্ব বাংলার জনগণের উপর পেশি শক্তি ব্যবহার করেছিল। তাই না স্যার?

শিক্ষক : হ্যাঁ, এই আন্দোলনকে দমনের লক্ষ্যে পশ্চিম পাকিস্তান সরকার রাষ্ট্রীয় বাহিনীর পেশি শক্তি ব্যবহার করে। যেমন ১৯৬৯ সালের ২০ জানুয়ারি সকল ছাত্র সংগঠন ১৯৬৬ সালের ছয় দফা ও ছাত্র সমাজের পাঁচ দফাসহ মোট ১১ দফা দাবি আদায়ের আন্দোলন চলাকালীন পুলিশ জনতার উপর গুলি চালায়। এতে ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামান শহিদ হলে আন্দোলন যেন অগ্নি-আন্দোলনে পরিণত হয়। আর ইহাই ছিল গণঅভ্যুত্থানের মাইলস্টোন।

ছাত্র : স্যার, ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামান শহিদ হলে পূর্ব বাংলার জনগণের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা আরো প্রবল হয়। তাই না স্যার?

শিক্ষক : হ্যাঁ, তবে শুধু এই হত্যাকাণ্ড পূর্ব বাংলার জনগণের গণঅসন্তোষের মূল কারণ নয়। আরো অনেক কারণ আছে। যেমন: বায়ান্ন'র ভাষা আন্দোলন, ৬৬'র ছয়দফা দাবি আদায়ে অস্বীকৃতি ইত্যাদি। তবে ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার জনগণের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয় এবং স্বাধীনতা অবশ্যম্ভাবী হয়ে পরে।

দফতরি : [স্যার, আমি কী অফিস কক্ষ বন্ধ করে দিবো? স্কুল তো ছুটি হয়ে গেছে।]

শিক্ষক : না। আমার কিছু কাজ বাকি আছে, আমি এখনই আসছি।

ছাত্র : ধন্যবাদ স্যার। গণঅভ্যুত্থান সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও অজানা তথ্য এবং তাৎপর্য সম্পর্কে জানতে পারলাম।

শিক্ষক : ঠিক আছে। কোনো বিষয়ে দ্বিধায় পড়লে জানিয়ো, আলোচনা করা যাবে।

ছাত্র : জ্বি স্যার, আজ তাহলে আসি।

০৭। পড়াশোনা শেষ করে চাকরি গ্রহণ এবং স্ব-উদ্যোগে গৃহীত কোনো কাজের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহকরণ সম্পর্কে দুই বন্ধুর মধ্যে একটি সংলাপ রচনা করুন। [৪০তম বিসিএস]

উত্তর:

[পড়াশোনা শেষ করে চাকরি গ্রহণ এবং স্ব-উদ্যোগে গৃহীত কোনো কাজের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহকরণ সম্পর্কে দুই বন্ধুর মধ্যে একটি সংলাপ]

স্থান	:	বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাফেটেরিয়া	সময়	:	বেলা ১১.০০ টা

কাজল : (হেসে হেসে) কেমন আছিস, শফিক? কত দিন পর তোর সাথে দেখা।

শফিক : আছি ভালোই। তোর খবর কী? আছিস কেমন?

কাজল : আমিও ভালোই আছি। এতোদিন কোথায় ছিলি?

শফিক : বাবা অসুস্থ ছিল, তাই গ্রামের বাড়িতে ছিলাম। তবে এখন সুস্থ আছে।

কাজল : এ জন্যই তো মাস্টার্সের রেজাল্টের দিনও তোকে দেখিনি!

শফিক : অভিনন্দন বন্ধু, তুই তো ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিস।

কাজল : হুম, ঠিক শুনেছিস। তুইও তো ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিস।

শফিক : এখন কী করবি, কিছু ভেবেছিস? আমি কিন্তু এসব চাকরি-বাকরির পেছনে ছুটবো না!

কাজল : (অবাক হয়ে) কী বলিস? আমি তো ইতোমধ্যে একটা বিসিএস কোচিং সেন্টারে ভর্তি হয়ে গেছি। ৫১তম বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষা দিব। (কিছুটা উদ্বিগ্ন) কিন্তু তুই তাহলে কী করতে চাস?

শফিক : হুম, এটা খুব ভালো কথা শুনালি বন্ধু। কিন্তু আমি উদ্যোক্তা হবো।

কাজল : কিন্তু উদ্যোক্তা হতে হলে অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে, অনেক ঝুঁকি নিতে হবে। এছাড়া অনেক টাকা-পয়সাও লাগবে।

শফিক : তা তো জানি বন্ধু। আসলে আমি পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হতে চাই না। চাকরি মানে তো অন্যের অধীনে চলা। আমি অন্যের অধীনে থাকতে চাই না। [এ সময় তৃতীয় বন্ধু প্রবেশ করে]

আজাদ : [তোদের কথা শুনে এখানে আসলাম। আসলে চাকরি আর স্ব-উদ্যোগ দুটোরই গুরুত্ব আছে। চাকরি নিরাপত্তা দেয় আর উদ্যোগ মানুষকে কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী বানায়।]

কাজল : আজাদ ভালো বলেছিস। আচ্ছা শফিক, তুই কী ধরনের উদ্যোক্তা হতে চাস? [আজাদ বিদায় নেয়]

শফিক : আমি ই-কমার্স বিজনেস করবো।

কাজল : কীভাবে কী করবি, কিছু পরিকল্পনা করেছিস?

শফিক : হ্যাঁ, আমি চায়না থেকে প্রোডাক্ট আনবো।

কাজল : কী ধরনের প্রোডাক্ট আনবি? কীভাবে আনবি?

শফিক : চায়না থেকে আমার ছোট মামা বিভিন্ন ধরনের খেলনা, পোশাক, মোবাইলসহ বিভিন্ন চাহিদাসম্পন্ন জিনিস কিনে পাঠাবে। আমি সেগুলো বাংলাদেশে বিক্রি করবো।

কাজল : খুব ভালো পরিকল্পনা। তো অনলাইনে বিক্রি করবি, নাকি দোকান নিবি?

শফিক : আপাতত অনলাইনেই বেচবো। এজন্যই তো আমি ডিজিটাল মার্কেটিং কোর্সটা করছি।

কাজল : হ্যাঁ, বন্ধু। বর্তমান আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে উদ্যোক্তা হওয়ার বহু সুযোগ ও সম্ভাবনা রয়েছে।

শফিক : এবার তোর কথা বল।

কাজল : আমার চিন্তা এখন একটাই। আর তা হলো সরকারি চাকরি। তবে আমার প্রথম পছন্দ পররাষ্ট্র ক্যাডার।

শফিক : কিন্তু এটা তো অনেক কঠিন ব্যাপার!

কাজল : তা জানি। টার্গেট অনেক কঠিন হলে, প্রস্তুতিটাও অনেক মজবুত হতে হবে। আর প্রস্তুতি মজবুত হলে, চাকরি পাওয়াটাও সহজ হবে।

শফিক : খুব ভালো, তোর স্বপ্ন পূরণ হোক। ক্যাডার হওয়ার মনোবাসনা নিয়ে ঠিকমতো প্রস্তুতি নে।

কাজল : তোর জন্যও শুভকামনা রইলো, বন্ধু। তোর ব্যবসা শুরু কর এবং প্রতিষ্ঠা অর্জন কর।

শফিক : আচ্ছা বন্ধু, ধন্যবাদ। চল এবার সামনের দিকে আগাই।

কাজল : হ্যাঁ, চল।

০৮। **বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রবীণ শিক্ষক এবং অধ্যয়নরত একজন তরুণ শিক্ষার্থীর মধ্যে শিক্ষার অতীত ও বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে একটি কাল্পনিক সংলাপ রচনা করুন।** **[৩৮তম বিসিএস]**

উত্তর:

[শিক্ষার অতীত ও বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে প্রবীণ শিক্ষক ও তরুণ শিক্ষার্থীর মধ্যে কথোপকথন]

স্থান	:	বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ	সময়	:	বিকাল ৫.০০ টা

শিক্ষার্থী : (বিনম্র স্বরে) স্যার, আস্সালামু আলাইকুম। কেমন আছেন, স্যার?

শিক্ষক : (খুশি মনে) ওয়ালাইকুম আস্সালাম, ভালো আছি । তুমি কেমন আছ? তোমার পড়াশোনা কেমন চলছে?

শিক্ষার্থী : (হতাশ ভঙ্গিতে) ভালো আছি, স্যার। পড়াশোনার অবস্থা ভালো যাচ্ছে না আমার। সবাই গাইড বই মুখস্থ করছে। মূল বই পড়েতো ভালোও করা যাচ্ছে না।

শিক্ষক : তোমাদের এ হলো এক সমস্যা। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি অর্জন করে চলে যাও, তবু পাঠ্য বইয়ের একটা পাতাও খুলে দেখো না। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা দিন দিন কোথায় যে যাচ্ছে?

শিক্ষার্থী : স্যার, সবাই তো শুধু রেজাল্ট দেখে। সরকারি-বেসরকারি চাকরিতে ফলাফলের জন্য শুধু সনদটাই দেখা হয়।

শিক্ষক : হ্যাঁ, আমাদের গুণগত শিক্ষার তুলনায় পরিমাণগত এবং সনদধারী শিক্ষার দিকে ঝোঁক বাড়ছে। আমাদের সময় প্রচুর পড়তে হতো। পাঠ্য-পুস্তকের অপ্রতুলতাও ছিল। কিন্তু এখন সবকিছু সহজলভ্য। আসলে বর্তমানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী সবাই প্রায় অলস হয়ে পড়ছে। ভালো শিক্ষার্থী না থাকলে ভালো শিক্ষকও জানতে চেষ্টা করেন না।

শিক্ষার্থী : স্যার, আমরা যে বিষয়ে পড়াশুনা করি, সে বিষয়ের অভিজ্ঞতার বাস্তব প্রয়োগ করার জন্য আমাদের যথেষ্ট ক্ষেত্র নেই। ছাত্র জীবনের মূল্যবান সময় ব্যয় করে আমরা ডিগ্রি লাভ করি। কিন্তু চাকরির জন্য সবাইকে একই পড়াশোনা করতে হয়।

শিক্ষক : ঠিকই বলেছ তুমি। বিষয়ভিত্তিক শিক্ষা অনুসারে আলাদা সেক্টর আমরা তৈরি করতে পারিনি। ফলে প্রতিবছর মেধাবী শিক্ষার্থীরা দেশের বাইরে চলে যাচ্ছে। আর তাদের অধিকাংশ ফেরতও আসছে না। ফলে জাতীয় দিক থেকে আমরা আরও ধসে যাচ্ছি।

শিক্ষার্থী : (উদ্বিগ্ন প্রকাশ) সরকারি চাকরি না পেলে পড়াশোনা করে লাভ কী?

শিক্ষক : শুধু সরকারি চাকরির আশায় থাকা যাবে না। এটাই বড় সমস্যা। চাকরির জন্য সবাই সনদটা ভালো করার দিকে নজর দেয় কিন্তু গুণগত দিকটা দেখে না। প্রতিবছর হাজার হাজার জিপিএ-৫ ডিগ্রিধারী ছাত্র-ছাত্রী বেরোচ্ছে। তাদের শিক্ষার গুণগত মান নিয়ে প্রশ্ন আছে। তুমি কী মনে কর?

শিক্ষার্থী : ঠিক বলেছেন, স্যার। এজন্য কারা দায়ী বলে আপনি মনে করেন?

শিক্ষক : সবাইকে এ দায়ভার বহন করতে হবে- রাষ্ট্র, অভিভাবক, শিক্ষক এমনকি শিক্ষার্থীরও। কিছুদিন আগে প্রশ্নফাঁস হওয়ার একটা প্রবণতা তৈরি হয়েছিল। অভিভাবকরা সন্তানের ফলাফল ভালো করার জন্য কমিটি গঠন করে প্রশ্নফাঁস করেছে। আমরা পত্রিকার মাধ্যমে জেনেছি। কী জঘন্য! কোথায় যাচ্ছি আমরা?

শিক্ষার্থী : বর্তমান তথ্য-প্রযুক্তির যুগে শিক্ষার বিস্তারে এর ভূমিকা কতটুকু বলে আপনি মনে করেন?

শিক্ষক : আসলে জানো সোহাগ, বিজ্ঞান আমাদেরকে বেগ দিয়েছে কিন্তু অনেক কিছু কেড়েও নিয়েছে। বিজ্ঞান একইসাথে অভিশাপ ও আশীর্বাদ হতে পারে। সেটা ব্যবহারের উপর নির্ভর করে।

শিক্ষার্থী : অতীতে শিক্ষার ক্ষেত্রে কী ধরনের প্রতিবন্ধকতা ছিল যা আজকের শিক্ষাব্যবস্থার সাথে তৎকালীন শিক্ষার পার্থক্য তৈরি করেছে?

শিক্ষক : অতীতে নারীদের শিক্ষার ব্যবস্থা তেমন ছিল না বললেই চলে। অনেক প্রকার কুসংস্কার প্রচলিত ছিল। এখন তো রাষ্ট্র শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি দিচ্ছে, টিফিন দিচ্ছে, শিক্ষাকে অবৈতনিক করেছে। সর্বোপরি অনেক সুবিধা রাষ্ট্র দিচ্ছে। শিক্ষাক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার অতীত ও বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে বড় ধরনের ব্যবধান তৈরি করেছে।

শিক্ষার্থী : ধন্যবাদ, স্যার। আপনার সাথে কথা বলে অনেক কিছু জানতে পারলাম।

শিক্ষক : তোমাকেও ধন্যবাদ। তোমার আগ্রহ দেখে আমি খুশি হয়েছি। ভালো থেকো।

০৯। বিদেশে পড়াশোনা করে প্রবাস জীবন নির্বাচন এবং বাংলাদেশে লেখাপড়া করে স্বদেশেই অবস্থান করা সম্পর্কে দুই বন্ধুর কথোপকথন বা সংলাপ লিখুন। [৩৭তম বিসিএস]

উত্তর:

[বিদেশে পড়াশোনা করে প্রবাস জীবন নির্বাচন এবং বাংলাদেশে লেখাপড়া করে স্বদেশেই অবস্থান করা সম্পর্কে দুই বন্ধুর সংলাপ]

স্থান	:	বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাফেটেরিয়া	সময়	:	সন্ধ্যা ৬.০০ টা

সুজন : (খুশি খুশি মনে) কী বন্ধু, কেমন আছো?

আরিফ : ভালো। দীর্ঘ তিন বছর পরে তোমার সঙ্গে দেখা। তুমি না বিদেশে পড়াশোনা করছিলে?

সুজন : আমি জাপানের টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে Urban Studies-এ পড়ছি এবং সেখানে থেকে যাওয়ার চিন্তা করছি।

আরিফ : (বিস্ময় প্রকাশ) কী বলছো! আমি অবাক না হয়ে পারছি না। তোমার মতো মেধাবী বুয়েট থেকে পাশ করে বিদেশে ডিগ্রি নিয়ে থেকে যাওয়ার চিন্তা করছো?

সুজন : আরিফ, তুমি তো জানোই দেশে মেধার মূল্যায়ন নেই। কী আর করবো? আমার সঙ্গে যারা পড়তো তাদের ৯০% বিদেশ চলে গেছে। ওখানে জীবন ব্যবস্থা অনেক ভালো। কাজের নিরাপত্তাও আছে।

আরিফ : ঠিক আছে, তোমার কথার কিছুটা সত্যতা রয়েছে। কিন্তু অনেকেই এখন বিদেশ থেকে ডিগ্রি নিয়ে দেশেই ভালো কিছু করছে। সমাজ ও রাষ্ট্রের সেবা করছে এবং ভালো আছে। বাংলাদেশ এখন উন্নয়নশীল দেশ, ইকোনমিও ভালো।

সুজন : তা ঠিক বলেছ। কিন্তু দেশে এসে কিছু করব সাহস পাচ্ছি না।

আরিফ : তুমি আমার দিকে দেখ। আমি বুয়েট থেকে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পাশ করে এদেশে সফটওয়্যার ফার্ম দিয়েছি। এখন আমি বিভিন্ন সফটওয়্যার বিদেশে রপ্তানি করি এবং সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যুক্ত। এ দেশের সমাজের পরিবারের সেবা করছি, যেটা তুমি বিদেশে থেকে করতে পারবে না। আমি তোমাকে বলব এদেশে এসে সমাজ ও রাষ্ট্রের, পরিশেষে নিজের ও পরিবারের সেবা করো এবং আদর্শ জীবন গড়ো।

সুজন : ধন্যবাদ বন্ধু আরিফ, আমার চিন্তায় বিষয়টা আনার জন্য। এভাবে কখনো ভেবে দেখিনি বন্ধু। আমি অতি শীঘ্রই তা করার চেষ্টা করব।

আরিফ : তোমাকেও ধন্যবাদ, তুমি বিষয়টি অনুধাবন করতে পারার জন্য।

১০। একজন প্রবীণ মুক্তিযোদ্ধা এবং স্বাধীনতা পরবর্তী প্রজন্মের এক তরুণের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে সংলাপ লিখুন। [৩৬তম বিসিএস]

উত্তর:

[একজন প্রবীণ মুক্তিযোদ্ধা এবং স্বাধীনতা পরবর্তী প্রজন্মের এক তরুণের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে সংলাপ]

স্থান	:	গ্রামের মাঠ	সময়	:	সকাল ১০.০০ টা

তরুণ : চাচা, আস্সালামু আলাইকুম। কেমন আছেন? আপনি তো মুক্তিযোদ্ধা। আজ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে আপনার অভিজ্ঞতা শুনব।

মুক্তিযোদ্ধা : (বিস্ময় প্রকাশ) ওয়ালাইকুম আস্সালাম, ভালো আছি। তুমি মুক্তিযুদ্ধের কথা জানতে চেয়েছ। আজকাল তো তরুণেরা তেমন শুনতে চায় না। (দীর্ঘ শ্বাস ফেলে) ৭১-এর এত বড় ঘটনা তরুণদের প্রাণে আলোড়ন তোলে না, এটা ভেবে কষ্ট পাই। তুমি প্রশ্ন কর, তাহলে আমার বলতে সুবিধা হবে।

তরুণ : ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার আগে আপনি কী করতেন?

মুক্তিযোদ্ধা : ময়মনসিংহ রেল স্টেশনের কাছে আমার এক আত্মীয়ের দোকানে কাজ করতাম।

তরুণ : আপনি যুদ্ধে গেলেন কেন?

মুক্তিযোদ্ধা : জন্মভূমিকে রক্ষার ডাক আসছিল, তাই যুদ্ধে গিয়েছি।

তরুণ : বিষয়টা একটু খুলে বলুন।

মুক্তিযোদ্ধা : বাপ-দাদার কাছে সবসময় শুনতাম পাকিস্তানিরা আমাদের মানুষ মনে করে না। বিষয়টা বুঝতাম না। একটু বড় হয়ে নিজের চোখেই সব দেখলাম। '৭০-এর নির্বাচনের মাসখানেক আগে এই দেশে একটা বিরাট ঘূর্ণিঝড় হলো। এই ঘূর্ণিঝড়ে লাখ লাখ লোক মারা গেল। কিন্তু পাকিস্তানিরা এদেশের মানুষকে কোনো সাহায্যই করল না। অন্যদিকে বিদেশ থেকে যে সাহায্য আসত তা তাদের নিজের দেশ পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যেত। ১৯৭০ সালে চাপের মুখে পড়ে তারা নির্বাচন দিল। নির্বাচনে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে তৎকালীন আওয়ামী লীগ জয়লাভ করে, কিন্তু তারা ক্ষমতা ছাড়েনি। এই সময় শুনলাম ৭ই মার্চ শেখ মুজিব ভাষণ দিবেন। ঐ ভাষণেই আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হবে। তো আমরা কয়েকজন ট্রেনে চড়ে ঢাকায় চলে আসলাম শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ শোনার জন্য। সেই ভাষণে শরীরের রক্ত টগবগ করে ফুটতে লাগল। "তোমাদের যার যা কিছু আছে, তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে....।" আমরা সেদিন থেকেই শত্রুর মোকাবিলার প্রস্তুতি নিলাম। আমি আর আমার বন্ধু খোকন। খোকন বেঁচে নেই, যুদ্ধে শহিদ হয়েছে। দুজন ঐ দিনই সিদ্ধান্ত নিলাম যে, দেশে যুদ্ধ শুরু হবে, যুদ্ধে যাব। আর দোকানের কাজে যাব না। যুদ্ধে গেলাম, পায়ে গুলি লাগল।

তরুণ : আপনি কী ট্রেনিং নিয়েছিলেন?

মুক্তিযোদ্ধা : হ্যাঁ, ১৯৭১ সালের মে মাসে আমি আখাউড়া সীমান্ত দিয়ে ভারতে যাই এবং ওখানে ট্রেনিং করি। এক মাস পরে দেশে এসে রাজশাহীতে গেরিলা যুদ্ধে অংশ নেই। আমাদের সাথে প্রায় ৩৬ জন যোদ্ধা ছিল।

তরুণ : যে অপারেশনে আপনার পায়ে গুলি লেগেছে, সেই ঘটনাটি বলুন।

মুক্তিযোদ্ধা : ঐটা ছিল মতিন নগর। ঘটনাটা ১৯৭১ সালের আগস্ট মাসের। পাকিস্তানি বাহিনী মোহনপুর ক্যাম্প থেকে ঝলপুর, ধলুর, মাঝিনগর এলাকায় আসত এই মতিন নগরের রাস্তা দিয়ে। আমাদের কমান্ডার বললেন পাকিস্তানিদের মনোবল ভাঙার জন্য দিনের বেলাতেই সেখানে একটা গুপ্ত হামলা চালাতে হবে। পরিকল্পনামতো আমরা ছয়জনের একটা দল সফলভাবে আক্রমণ শেষ করে আশ্রয়ের জন্য পাশের গ্রামের একটা বাড়িতে গিয়ে উঠি। ঐ এলাকার রাজাকার পাকিস্তানি আর্মির কাছে আমাদের অবস্থান জানিয়ে দেয়। তারা তিনদিক থেকে আমাদের ঘিরে ফেলে। আমি পালানোর চেষ্টা করে গুলিবিদ্ধ হই। তবে ক্রলিং করে পালিয়ে আসতে সক্ষম হই।

তরুণ : তার মানে অপারেশনে আপনারা সফল, কিন্তু রাজাকারদের ষড়যন্ত্রের কাছে হেরে যান।

মুক্তিযোদ্ধা : ঠিক। একটা কথা কী জানো বাবা, ঐ অপারেশন কেন? রাজাকারেরা না থাকলে দেশ স্বাধীন করতে ৯ মাস লাগত না, ৩ মাসেই হয়ে যেত। যাদের সাথে আমাদের ভাষার মিল নাই, চেহারার মিল নেই, খাবারের মিল নেই, ওরা রাস্তাঘাট চিনে না, ওদের তো টিকে থাকবার প্রশ্নই ওঠে না।

তরুণ : চাচা, আপনি কি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে সার্টিফিকেট পেয়েছেন?

মুক্তিযোদ্ধা : না, বাবা, কোনো কিছু পাওয়ার জন্য যুদ্ধ করিনি। সেজন্য সার্টিফিকেট বা তালিকায় নাম লেখানোর কথা ভাবিনি। দেশ স্বাধীন করব, এটাই ছিল আমাদের লক্ষ্য। আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি, এর চেয়ে বড় পাওয়া আর কী আছে, যুদ্ধ করেছি দেশকে ভালোবেসে, লোক দেখানোর জন্য নয়।

তরুণ : এখনও সরকার মুক্তিযুদ্ধের স্বীকৃতি স্বরূপ নানা পদক্ষেপ নিচ্ছেন, সহায়তা দিচ্ছেন।

মুক্তিযোদ্ধা : বাবা, আমার সার্টিফিকেট নেই, সরকারি সহায়তাও পাইনি। খুব আশাও করিনি। শান্তি বাহিনীর হয়ে কাজ করেছে এমন লোকজন ভোল পাল্টিয়ে সহায়তা নিচ্ছে। তাদের অনেকে মুক্তিযুদ্ধের স্লোগানগুলোতে কোরাস তুলছে, দেখে খারাপ লাগে।

তরুণ : (দুঃখ প্রকাশ) চাচা, আমাদেরও খারাপ লাগে; আমরা চাই প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধারা যেন যথাযথ সম্মান লাভ করেন। আমাদের তরুণ প্রজন্মের জন্য দোয়া করবেন।

মুক্তিযোদ্ধা : অবশ্যই, তোমরা আমাদের মুখ উজ্জ্বল করবে আশা করি। ভালো থেকো।

তরুণ : আপনিও ভালো থাকবেন, চাচা।

১১। ১০ বছরের একটি ছেলে হারিয়ে গেছে। ছেলেটির মা-বাবা গেছেন থানায়। পুলিশ মামলা নিতে চাইছে না। ছেলেটির মা-বাবা এবং একজন পুলিশ কর্মকর্তার চরিত্র অবলম্বন করে এই পরিস্থিতির উপযুক্ত সংলাপ রচনা করুন। [৩৫তম বিসিএস]

উত্তর:

[হারিয়ে যাওয়া ছেলের মা-বাবা এবং একজন পুলিশ কর্মকর্তার মধ্যে মামলা করা নিয়ে সংলাপ]

আকাশ একজন ব্যাংকার। তার স্ত্রী মৌসুমী একজন কলেজ শিক্ষিকা। তাদের একমাত্র ছেলে রানাকে কয়েকদিন ধরে পাওয়া যাচ্ছে না। তাদের ধারণা যে, কেউ তাকে অপহরণ করেছে। তাই তারা দুজনে রমনা থানায় এসেছেন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের নামে মামলা করতে। থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নাজমুল মামলা নিতে চাইছেন না। এমতাবস্থায় তাদের মধ্যকার সংলাপটি নিম্নরূপ:

স্থান	:	পুলিশের মডেল থানা	সময়	:	বেলা ১১.০০ টা

আকাশ : (উৎকণ্ঠা নিয়ে প্রশ্ন) আস্সালামু আলাইকুম। আমি একটু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সাথে কথা বলতে চাই।

নাজমুল : ওয়ালাইকুম আসসালাম। জ্বি, আমিই এই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। বলুন, আপনাদের জন্যে কী করতে পারি?

আকাশ : আসলে আমরা এসেছিলাম একটা মামলা করার জন্যে।

নাজমুল : কোন বিষয়ে? কার বিরুদ্ধে?

মৌসুমী : (কাঁদো কাঁদো গলায়) আমাদের ১০ বছর বয়সী ছেলে রানাকে আমরা গত দুইদিন ধরে খুঁজে পাচ্ছি না। তাই আমরা থানায় এসেছি মামলা করার জন্যে।

নাজমুল : আপনাদের ছেলে হারিয়ে গেছে, তাই মামলা করতে এসেছেন, কিন্তু তার আগে কোথাও কি তার খোঁজ করেছেন?

আকাশ : হ্যাঁ, আমরা আমাদের বাড়ির চারপাশের প্রতিবেশীদের ফ্ল্যাটে, স্কুলে, ওর বন্ধুদের বাড়িতে এবং আমাদের নিকট আত্মীয়দের বাড়িতে ওকে খোঁজ করেছি।

নাজমুল : আর কী কী চেষ্টা করেছেন?

আকাশ : আমরা মসজিদের মাইক দিয়ে মহল্লায় 'হারানো গিয়েছে' শিরোনামে বিজ্ঞপ্তি দিয়েছি এবং প্রচার মাইক ভাড়া করে পার্শ্ববর্তী এলাকায় প্রচার করেছি। কোথাও তাকে পাওয়া গেলে সন্ধান দেওয়ার জন্যে অনুরোধ করেছি। পাশাপাশি সন্ধানদাতাকে পুরস্কৃত করার ঘোষণাও দিয়েছি।

নাজমুল : কেউ কোনো সন্ধান দিয়েছে?

মৌসুমী : না। এখনো কোনো সন্ধান পাইনি।

নাজমুল : থানায় কিংবা হাসপাতালে কোনো খোঁজ করেছেন?

আকাশ : হ্যাঁ, করেছি। কিন্তু কোনো খোঁজ পাইনি।

নাজমুল : থানায় কোনো জিডি করেছেন?

আকাশ : করতে এসেছিলাম, কিন্তু পুলিশ কোনো জিডি নেয়নি বরং তারা ভালো করে খুঁজতে পরামর্শ দিয়েছে।

নাজমুল : ছেলে হারিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে কাউকে কি কোনো সন্দেহ করেন?

আকাশ : আমার কাছ থেকে তেমন কাউকে সন্দেহজনক বলে মনে হয় না। আবার নিঃসন্দেহও হতে পারছি না। কারণ আমি হয়ত কাউকে শত্রু বলে মনে করি না। কিন্তু অন্যরা যে আমাকে সবসময় সুদৃষ্টিতে দেখে সেটাতো সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় না। আমার অবস্থানের দিকে লক্ষ রেখে কেউ হয়ত তার অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্যে আমার ছেলেকে অপহরণ করতে পারে।

নাজমুল : কোথাও থেকে কি এমন কোনো ফোন বা চিঠি পেয়েছেন যার ভিত্তিতে আপনি এমনটি মনে করছেন?

আকাশ : না। তেমন কোনো ফোন বা চিঠি পাইনি।

নাজমুল : যদি এমন কিছু না হয়ে থাকে তাহলে তো আপনি কারও বিরুদ্ধে কোনো মামলা করতে পারবেন না।

মৌসুমী : আমরা প্রত্যক্ষভাবে কাউকে ইঙ্গিত করে মামলা করতে না পারলেও, অজ্ঞাতনামা কারও বিরুদ্ধে তো মামলা করতে পারি।

নাজমুল : তা হয়ত করতে পারেন, কিন্তু সেটা খুব একটা ফলপ্রসূ হবে বলে মনে হয় না। এই কারণে আমরা মামলা নিতে পারছি না।

আকাশ : (অস্থিরতা প্রকাশ) তাহলে আমরা কী করতে পারি? আমরা তো আমাদের ছেলের কোনো খোঁজই পাচ্ছি না।

নাজমুল : আপনারা বরং বাড়ি যান। আত্মীয়-স্বজনদের বাসায় ভালো করে খোঁজ করুন। হাসপাতালসহ অন্যান্য পুলিশ ফাঁড়িতে খোঁজ করুন। পত্রিকায় হারানো বিজ্ঞপ্তি দিন। দেখুন কোনো সন্ধান পাওয়া যায় কিনা।

আকাশ : তা না হয় করলাম। কিন্তু আপনারা কি কোনোভাবেই মামলা নিতে পারবেন না?

নাজমুল : না। আমরা এভাবে মামলা নিতে পারব না। আপনি চাইলে বরং একটা সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করতে পারেন। আমরা আমাদের সাধ্য অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবো।

আকাশ : ঠিক আছে আমরা তাহলে তাই করবো।

নাজমুল : আমি থানার পরিদর্শককে বলে দিচ্ছি। আপনারা সেখানে গিয়ে জিডি করে নিন।

আকাশ : ধন্যবাদ, আমাদেরকে সহযোগিতা করার জন্যে।

নাজমুল : আপনাদেরকেও ধন্যবাদ, আমরা কোনো সন্ধান পেলে আপনাদেরকে অবহিত করবো। চিন্তা করবেন না, ইনশাআল্লাহ সব ঠিক হয়ে যাবে।

আকাশ : আল্লাহ ভরসা।

১২। **যুব সমাজের নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয় বিষয়ে দুই জন সচেতন অভিভাবকের সংলাপ রচনা করুন।**

উত্তর:

[যুব সমাজের নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয় বিষয়ে দুইজন সচেতন অভিভাবকের মধ্যে সংলাপ]

স্থান	:	শহরের উদ্যান	সময়	:	বিকাল ৫.০০ টা

মোস্তফা : (খুশি মনে) আরে মিথুন মিয়া নাকি, কী খবর? কেমন আছো?

মিথুন : আরে মিয়া ভাই। আমার দিন চলে যাচ্ছে আরকি। আপনি কেমন আছেন?

মোস্তফা : শারীরিকভাবে সুস্থই আছি। ছেলেকে তো ডাক্তার বানালে, মিথুন। এবার খাটাখাটুনি একটু কমাও, একটু বিশ্রাম নাও।

মিথুন : (আক্ষেপ প্রকাশ) ঠিকই বলেছেন মিয়া ভাই, ছেলেকে ডাক্তার বানিয়েছি সত্যি, কিন্তু মানুষ বানাতে পারিনি।

মোস্তফা : (অবাক হয়ে) কেন? কী হয়েছে তোমার ছেলের?

মিথুন : হওয়ার আর কী বাকি আছে, মিয়া ভাই? নেশা করে বাড়ি ফিরে। পরদিন দুপুর বেলা পর্যন্ত ঘুমায়। কিছু বলতে গেলেই চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে। গত মাসে বউমা নাতিকে নিয়ে বাপের বাড়ি চলে গেছে। কী করবে? ভদ্র ঘরের মেয়ে। কত সহ্য করবে?

মোস্তফা : নিজে ডাক্তার। নেশার পরিণাম তো তার অজানা নয়, তবু যে কেন অমন করছে...। কী আর বলবো মিথুন আলী।

মিথুন : আজকালকের ছেলেমেয়েদের বোঝা বড় ভার। আমার ছেলেটাও তো মানুষ হলো না। উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে পাঠালাম। শিক্ষা তো হলোই না, উলটো বিজাতীয় সংস্কৃতির খপ্পরে পড়ে বখে গেল। কাঁদতে কাঁদতে ওর মায়ের চোখের কোণে ঘা হয়ে গেছে। ফোনও করে না, আসেও না। ভুল বোধহয় আমাদেরই মিয়া ভাই। ছোট থেকে ছেলেমেয়েদের আমরা মানুষ বানাতে চাইনি। খালি ডাক্তার আর ইঞ্জিনিয়ার বানাতে চেয়েছি। এখন আর তাদের দোষ দিয়ে লাভ কী?

মোস্তফা : ঠিকই বলেছ, মিথুন। দোষ আমাদেরও আছে। সেই সাথে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস, নৈরাজ্য, শিক্ষকদের দায়িত্বহীনতা, উপযুক্ত মানুষ হয়ে গড়ে ওঠে এমন শিক্ষার অভাব, অসৎ সঙ্গ, নেশাজাতীয় দ্রব্যাদির সহজলভ্যতা প্রভৃতিই আমাদের যুবসমাজকে অবক্ষয়ের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

মিথুন : এখন তো সবকিছুই হাতের মুঠোয়। বিশ্বে কোথায় কী হচ্ছে না হচ্ছে সবই তো ইন্টারনেটের মাধ্যমে পেয়ে যাচ্ছে? ভালোর চেয়ে মন্দের দিকেই আমাদের সন্তানরা এগিয়ে যাচ্ছে বেশি।

মোস্তফা : এগিয়ে যাবে যাক। কিন্তু এগোনোটা তো পজিটিভ হওয়া চাই। ফুল তো একটাই। মাকড়সা নেয় বিষ, মৌমাছি নেয় মধু। আমরা কী জানতাম আমাদের সন্তানেরা মধু না নিয়ে বিষ নেবে?

মিথুন : যুবসমাজের মধ্যে যদি সাহিত্য, সাংস্কৃতিক চেতনা ও স্বদেশপ্রেম জাগিয়ে তোলা যায়, তাহলে এই অবক্ষয় রোধ হতে পারে।

মোস্তফা : আমারও তাই মনে হয় মিথুন। তাছাড়া তরুণদের বিকশিত করতে হলে তাদের বিকাশের জন্য সুষ্ঠু সুযোগ দিতে হবে। এর জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন অনুকূল সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ।

মিথুন : তোমার সাথে আমি একমত। তবে বিদেশি অপসংস্কৃতির অবাধ প্রবেশকে নিষিদ্ধ করাও জরুরি। আমার মনে হয়, অপসংস্কৃতির মোহে তাদের জীবন অনেকখানি স্থবির ও বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েছে।

মোস্তফা : হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছো। তরুণদের জন্য সঠিক ও সুস্পষ্ট পথনির্দেশ করাও তাদের সুপথে ধরে রাখার জন্য আবশ্যক বলে আমি মনে করি। মিথুন, আমাদেরই উচিত এসব পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সঠিক পদক্ষেপ নিয়ে জনগণকেও উদ্বুদ্ধ করা।

মিথুন : হ্যাঁ, এ ব্যাপারে চেয়ারম্যান সাহেবের সাথে বিকেলে কথা বলা যাবে। এখন তবে যাই।

মোস্তফা : আচ্ছা, ভালো থেকো মিথুন।

১৩। মনে করুন আপনি তন্নী। পিংকি একজন মানবাধিকার কর্মী এবং তিনি কাজ করেন হিউম্যান রাইটস ওয়াচ-এ। রোহিঙ্গা শরণার্থী সমস্যা বিষয়ে তার সঙ্গে একটি কাল্পনিক সংলাপ রচনা করুন।

উত্তর:

[রোহিঙ্গা শরণার্থী সমস্যা বিষয়ে তন্নী এবং মানবাধিকারকর্মী পিংকির মধ্যে সংলাপ]

স্থান	:	রোহিঙ্গা ক্যাম্প সংলগ্ন এলাকা, কক্সবাজার	সময়	:	সকাল ১০.০০ টা

তন্নী : আসসালামু আলাইকুম। আপা, আপনি কেমন আছেন?

পিংকি : ওয়ালাইকুম আসসালাম। আমি ভালো আছি, তুমি কেমন আছো?

তন্নী : (উদ্বিগ্ন হয়ে) আমিও ভালো আছি, আপা। তবে রোহিঙ্গারা তো ব্যাপক সমস্যা তৈরি করেছে। আমাদের এলাকার ঠিকানা দিয়ে এক রোহিঙ্গা নাগরিকত্ব সনদ বানিয়েছে।

পিংকি : (বিরক্তি প্রকাশ) এতো দেখছি মহা সমস্যা।

তন্নী : এই সমস্যা সম্পর্কে আমাকে যদি কিছু বলতেন।

পিংকি : ঠিক আছে। রোহিঙ্গা শরণার্থী সমস্যা হচ্ছে একটি মিয়ানমারের জাতিগত ও সাম্প্রদায়িক সমস্যা এবং এটি বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যকার অন্যতম একটি দ্বিপাক্ষিক সমস্যাও বটে। দীর্ঘদিন ধরে এই সমস্যাটা চলে আসছে।

তন্নী : রোহিঙ্গা আসলে কারা?

পিংকি : রোহিঙ্গারা হলো মিয়ানমারের আরাকান রাজ্যের সংখ্যালঘু মুসলমান জাতি। মিয়ানমারের ১৩৫টি নৃ-গোষ্ঠীর মধ্যে এরা একটি। এরা মিয়ানমারের রাখাইন অঞ্চলের মোট জনসংখ্যার ২০ ভাগের বেশি। ২০০৯ সালে জাতিসংঘ পরিচালিত একটি জরিপ মতে এদের সংখ্যা ৭ লাখ ২৩ হাজার। জন্মসূত্রে এরা মূলত মিয়ানমারের নাগরিক। কিন্তু মিয়ানমারের কেন্দ্রীয় সরকার এদের আইনগত স্বীকৃতি দেয় না। ফলে এরা নিজদেশে পরবাসী।

তন্নী : তাহলে তো রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব অস্বীকারই এই সংকটের মূল কারণ। কখন থেকে এই সমস্যার সূত্রপাত হলো?

পিংকি : রোহিঙ্গা সমস্যার সূত্রপাত মূলত ১৯৭৭ সাল থেকে। ঐ সময় থেকেই মিয়ানমারের সরকার রোহিঙ্গাদের সাথে বৈষম্যমূলক আচরণ শুরু করে। ফলে প্রায় দুই লাখ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় গ্রহণ করে। পরে বাংলাদেশ-মিয়ানমার দ্বিপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে তারা নিজ দেশে ফেরত গেলেও ১৯৮২ সালে মিয়ানমারের সামরিক সরকার তাদের নাগরিকত্ব কেড়ে নেয় এবং পুনরায় উৎপীড়ন শুরু করলে ১৯৯২ সালে প্রায় তিন লাখের মতো রোহিঙ্গা বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়। সেই সময় থেকে বর্তমান পর্যন্ত রোহিঙ্গা সমস্যা দুই দেশের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে।

তন্নী : এ সমস্যা তো দেখছি আমাদের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। রোহিঙ্গা শরণার্থীরা বাংলাদেশের জন্য আর কী ধরনের সমস্যা তৈরি করছে?

পিংকি : রোহিঙ্গা শরণার্থীরা বাংলাদেশের জন্য বেশ কিছু সমস্যা তৈরি করছে। যেমন: প্রথমত, তাদের আগমনের কারণে এদেশের মোট জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল রাজনৈতিক সুবিধা লাভের জন্য তাদের রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার কারণে বাংলাদেশে এক ধরনের রাজনৈতিক সংকট তৈরি হচ্ছে। তৃতীয়ত, তারা জীবিকা নির্বাহের তাগিদে এদেশে কম মূল্যে শ্রম বিক্রি করায় এদেশের মূল শ্রমিকেরা বেকার হয়ে পড়ছে। চতুর্থত, তারা বিবাহসহ অন্যান্য পারিবারিক বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ায় সামাজিক সমস্যা তৈরি হচ্ছে। পঞ্চমত, তাদের অনুপ্রবেশের কারণে বাংলাদেশের সংরক্ষিত বনাঞ্চল ধ্বংস হচ্ছে, এতে বাংলাদেশের পরিবেশগত ক্ষতি হচ্ছে। এছাড়া অন্যান্য যেসব সমস্যা হচ্ছে তা হলো আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হচ্ছে, দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্কের অবনতি হচ্ছে এবং বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হচ্ছে।

তন্নী : এ থেকে তো আমাদের অবশ্যই মুক্তি পেতে হবে। এর জন্য কী করা যেতে পারে?

পিংকি : বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে। বাংলাদেশ-মিয়ানমার দ্বিপাক্ষিক, ত্রিপাক্ষিক কিংবা বহুপাক্ষিক আলোচনার প্রয়োজন। এর পাশাপাশি মিয়ানমারের উপর আন্তর্জাতিক চাপ প্রয়োগ করতে হবে। জাতিসংঘ সনদের বাস্তবায়নের মাধ্যমে এ সমস্যা সমাধান করতে হবে। মিয়ানমারে গণতন্ত্রায়ণ এ ক্ষেত্রে আবশ্যিক। রোহিঙ্গাদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দিতে হবে। সর্বোপরি আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি শ্রদ্ধা থাকলে এ সমস্যার সমাধান সম্ভব।

তন্নী : রোহিঙ্গা শরণার্থী সমস্যা সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য ও অভিমত দানের জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, আপা। এর মাধ্যমে আমি অনেক উপকৃত হয়েছি।

পিংকি : তোমাকেও অনেক ধন্যবাদ। আর আমারও নিজের কাছে ভালো লাগছে আমি তোমাকে সহায়তা করতে পেরেছি বলে।

তন্নী : আমি তাহলে আসি। ভালো থাকবেন।

পিংকি : তুমিও ভালো থেকো।

১৪। **তিন বন্ধু নাজমুল, মামুন, রাসেল একত্রে বসে সংবাদপত্র পড়ছে। বর্তমানে সংবাদপত্রের ভূমিকা নিয়ে তাদের মধ্যে একটি কাল্পনিক সংলাপ লিখুন।।**

উত্তর:

[বর্তমানে সংবাদপত্রের ভূমিকা নিয়ে তিন বন্ধু নাজমুল, মামুন, রাসেলের মধ্যে সংলাপ]

স্থান	:	বিশ্ববিদ্যালয় পাঠকক্ষ	সময়	:	সন্ধ্যা ৬.০০ টা

নাজমুল : (সংবাদপত্র পড়তে পড়তে) আজকাল সংবাদপত্রগুলো যেন কেমন হয়ে গেছে। (বিরক্তি প্রকাশ) কোনো বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ নেই।

মামুন : পত্রিকাগুলো তো আর জনগণের দিকে তাকিয়ে খবর ছাপে না। ওগুলো তো এখন হয়ে গেছে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মুখপাত্র।

রাসেল : (উদ্বিগ্ন প্রকাশ) কিন্তু এ অবস্থা চলতে থাকলে তো সংবাদপত্রগুলো তাদের অবস্থান হারাবে। মানুষ সংবাদপত্রগুলোর প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলবে। আর সংবাদপত্রগুলোও কাঙ্ক্ষিত সমাজ বিনির্মাণে ভূমিকা রাখতে পারবে না। এই অবস্থার পরিবর্তন দরকার। আমরা এমন সংবাদপত্র চাই যে সংবাদপত্র সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ভূমিকা পালন করতে পারে।

নাজমুল : (মাথা নেড়ে সম্মতি) হ্যাঁ, তুই ঠিকই বলেছিস। সংবাদপত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের এটা বুঝা উচিত যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে তাদের একটি ভূমিকা রয়েছে। তারা যদি সে দায়িত্ব পালন না করতে পারে তাহলে রাষ্ট্র ও সমাজ ক্ষতির সম্মুখীন হবে।

মামুন : তাদের শুধু ব্যবসায়িক দিকটা না দেখে নৈতিক ও জনগণের দিকেও খেয়াল দিতে হবে। তাদের অর্থাৎ সংবাদপত্রগুলোকে হতে হবে বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ। সব ধরনের পক্ষপাতিত্ব তাদের পরিহার করতে হবে। সত্য প্রকাশে তাদের হতে হবে নির্ভীক।

রাসেল : আমারও একই অভিমত। সংবাদপত্র ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে বুঝতে হবে যে তাদের একটি দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। তারা সরকার কিংবা বিরোধী দলের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের গঠনমূলক সমালোচনা করবে। ভালো কাজের প্রশংসা করবে, খারাপকে বর্জন করতে উৎসাহিত করবে। তোর কাছে কী মনে হয় নাজমুল? সংবাদপত্র কীভাবে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে অধিকতর ভূমিকা পালন করতে পারে।

নাজমুল : বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে সংবাদপত্রের ভূমিকা সম্পর্কে তুই বলেছিস। আরও কয়েকটি ক্ষেত্রে আমার মনে হয় সংবাদপত্র ভূমিকা পালন করতে পারে। যেমন: লেখাপড়া, খেলাধুলা, বিনোদন, বস্তুনিষ্ঠ আন্তর্জাতিক সংবাদ পরিবেশন, সম্পাদকীয় ইত্যাদি।

রাসেল : বিষয়গুলো একটু ব্যাখ্যা করবি?

নাজমুল : পড়াশোনার ক্ষেত্রে সংবাদপত্র শিক্ষকের ভূমিকা পালন করতে পারে। প্রতিদিন লেখাপড়া সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য, কৌশল, অনুশীলনী এবং প্রস্তুতি টিপস প্রদানের মাধ্যমে সংবাদপত্র পড়াশোনার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করতে পারে। বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলা সম্পর্কিত তথ্য পরিবেশন করে, খেলাধুলার ক্ষেত্রে, বিনোদন জগতের তথ্য পরিবেশন করে বিনোদনের ক্ষেত্রে, বহির্বিশ্বের তথ্য পরিবেশন করে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এবং সামসময়িক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে লেখা প্রকাশ করে সম্পাদকীয় এবং উপ-সম্পাদকীয় ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করতে পারে।

মামুন : আমার কাছে মনে হয় আরও কয়েকটি ক্ষেত্রে সংবাদপত্র ভূমিকা পালন করতে পারে। যেমন: জনমত জরিপের ক্ষেত্রে, জনমত গঠনে, বিভিন্ন দিবস উপলক্ষে ক্রোড়পত্র প্রচার করে এবং আমাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির রূপায়ণের এবং সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে।

রাসেল : আমার মনে হয় সংবাদপত্রগুলো যদি যথার্থভাবে এই দায়িত্বগুলো পালন করতে পারে, তাহলে দেশ ও জাতির উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারবে।

মামুন : হ্যাঁ, এভাবেই সম্ভব।

নাজমুল : ক'টা বাজে দেখেছিস? এখন বাসায় যাওয়ার সময় হয়েছে। চল উঠি তাহলে।

মামুন : চল উঠি।

১৫। একজন প্রবীণ সাংবাদিক এবং একজন টেলিফোন দর্শকের মধ্যে সামাজিক জীবনে তথা জনস্বার্থে গণমাধ্যমের ভূমিকা নিয়ে একটি কাল্পনিক সংলাপ রচনা করুন।

উত্তর:

[একজন প্রবীণ সাংবাদিক এবং একজন টেলিফোন দর্শকের মধ্যে সামাজিক জীবনে গণমাধ্যমের ভূমিকা নিয়ে সংলাপ]

স্থান	: একটি টিভি চ্যানেলের আলোচনা অনুষ্ঠান	সময়	: রাত ৯.০০ টা

প্রবীণ সাংবাদিক : টেলিভিশনের সামনে উপস্থিত সকল শ্রোতা ও দর্শকদেরকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

টেলিফোন দর্শক : [টেলিফোন থেকে কণ্ঠ ভেসে আসলো] স্যার, আপনাকেও শ্রোতাদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ ও অভিনন্দন। (হাসিখুশি গলায়) কারণ আপনার মতো একজন প্রবীণ গুণী ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলার সরাসরি সুযোগ পাওয়া অত্যন্ত আনন্দের বিষয়।

প্রবীণ সাংবাদিক : না, তেমন কিছু না, এই আপনারা আমরা মিলেই সমাজ।

টেলিফোন দর্শক : স্যার, আমরা দেখেছি সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে আপনার সাহসী পদক্ষেপে অনেক সময় অপ্রিয় সত্য ঘটনার প্রকাশ ঘটেছে। কিন্তু বর্তমানে সংবাদপত্রে সেই পথ ও মত প্রায়-ই অনুসৃত হচ্ছে না। এক্ষেত্রে আপনার অভিমত কী?

প্রবীণ সাংবাদিক : (মাথা নেড়ে সম্মতি প্রকাশ) হচ্ছে না বলা ঠিক নয়, কারণ কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ঘটলেও প্রায় ক্ষেত্রেই সাংবাদিকতার আদর্শকেই বড় করে দেখা হচ্ছে। আমরা আমাদের অবস্থান থেকে সত্য ও বাস্তবতাকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টাই করে যাচ্ছি।

টেলিফোন দর্শক : স্যার, আপনার ক্ষেত্রে সত্য হলেও আমরা তো প্রত্যক্ষদর্শী যে সংবাদপত্রগুলো প্রায়ই বাস্তবতার অন্তরালে মিথ্যা ও অলীককেও সত্য বলে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে।

প্রবীণ সাংবাদিক : আমি একেবারে না বলবো না। কারণ সম্প্রতি অনেক অবাস্তব বা অসত্য বিষয় বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে প্রচার করা হচ্ছে বাস্তবের চেয়ে বড় করে, একথা সত্য। তাই বলে অলীককে সর্বদা সত্য করে প্রচার করা হচ্ছে না।

টেলিফোন দর্শক : স্যার, আমি মনে করি সংবাদপত্রগুলোর অধিকাংশ পৃষ্ঠপোষকতাকে প্রাধান্য দিচ্ছে যার ফলে সামাজিক অসংগতি ও নাগরিক অধিকারের মতো বিষয়গুলো প্রায় তারা ছাপাতে ও প্রচার করতে অনীহা প্রকাশ করে। যার উদাহরণ আপনি নিজেই লক্ষ করেছেন বলে আমি মনে করি।

প্রবীণ সাংবাদিক : আপনার অভিমতের একেবারে পক্ষে নয় আবার একেবারে বিপক্ষেও নয়, অপ্রিয় হলেও সত্য যে আমরা সাংবাদিকরা আমাদের সঠিক অবস্থাতে স্থির হতে পারছি না। তা বিভিন্ন কারণে, কখনোবা মতাদর্শের কারণে আবার কখনো চাপেও বলা যায়।

টেলিফোন দর্শক : কিন্তু স্যার, সংবিধানে তো আপনাদের স্বাধীনতা প্রদানের অঙ্গীকার করা হয়েছে। তাহলে আপনারা কেন নিজস্ব চেতনা থেকে বিচ্যুত হচ্ছেন?

প্রবীণ সাংবাদিক : চেতনাকে ধারণ করেই আজ আমরা সাংবাদিক আর সামাজিক দায়বদ্ধতাই আমাদের বড় দায়। তাই আমরা চেষ্টা করি নাগরিক অধিকার ও গণতান্ত্রিক অধিকার নিয়ে কথা বলতে, তবে কিছু ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম যে হয় না, তা বলবো না। সাংবাদিকদের ক্ষেত্রে এখন আবার নতুন তকমা দেওয়া হচ্ছে যে 'হলুদ সাংবাদিকতা' যা সাংবাদিকদের মধ্যে একটি বিভেদও বলা যায়।

টেলিফোন দর্শক : স্যার, আমরা বর্তমান নাগরিকগণ অবগত যে, সাংবাদিকগণ প্রায়ই নাগরিক অধিকার ও আন্দোলনের স্বপক্ষে অবস্থান নেন না। কোনো ঘটনা প্রথম দিকে প্রচার করলেও পরে তা থেকে সরে দাঁড়ায়।

প্রবীণ সাংবাদিক : (অসম্মতি প্রকাশ) এটা পরিপূর্ণ ঠিক না। আমরা সর্বদাই বিভিন্ন ন্যায্য অধিকার ও আন্দোলনে সমর্থন করেছি ও পাশে অবস্থান করেছি। এর বহু দৃষ্টান্ত ও নজির রয়েছে যেগুলো আপনি সহজেই অনুধাবন করতে পারেন, বাংলাদেশ সৃষ্টি লগ্ন থেকেই সাংবাদিকগণ সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে, স্বাধীনতার স্বপক্ষে ছিল আজও আছে।

টেলিফোন দর্শক : হ্যাঁ, এটা একবাক্যে স্বীকার করি। কিন্তু বর্তমানে কিছু আছে কিছু নেই।

প্রবীণ সাংবাদিক : যাদের নেই তাদেরকে আমরা সাংবাদিক বলে ধরি না, তাদেরকে পৃষ্ঠপোষক ও স্বার্থান্বেষী বলে মনে করি।

টেলিফোন দর্শক : জ্বি স্যার, আমি আপনার সঙ্গে একমত। আপনার মূল্যবান তথ্য ও সময় দেবার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

প্রবীণ সাংবাদিক : আপনিসহ দর্শক শ্রোতাদের ধন্যবাদ ও শুভ কামনা রইল।

১৬। একজন প্রবীণ মুক্তিযোদ্ধা এবং একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রের মধ্যে একটি কাল্পনিক সংলাপ লিখুন।

উত্তর:

[একজন প্রবীণ মুক্তিযোদ্ধা এবং একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রের মধ্যে সংলাপ]

স্থান	:	শহরের উদ্যান	সময়	:	সকাল ৭.০০ টা

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র : (নম্র স্বরে) কেমন আছেন? আপনার বাসার সবাই কেমন আছেন?

প্রবীণ মুক্তিযোদ্ধা : ভালো আছে সবাই; তোমার অবস্থা বলো? তোমার গবেষণার কাজ কতদূর এগুলো?

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র : চলছে। তবে বেশ সতর্কতা অবলম্বন করতে হচ্ছে। কারণ হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে রচিত গ্রন্থ ও প্রামাণ্য দলিল সমূহে ইতিহাসের সত্যতা নির্ণয় করা দুরূহ ব্যাপার।

প্রবীণ মুক্তিযোদ্ধা : হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বুঝতে পেরেছ, কারণ মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বাংলাদেশের অস্তিত্বের ইতিহাস। তারপরও বিভিন্ন শাসন আমলে এই ইতিহাসকে নিজেদের অনুকূলে নিতে গিয়ে কিছুটা হলেও বিকৃতি করা হয়েছে। যা নতুন প্রজন্মের কাছে একটি দ্বন্দ্বের বিষয়ও বটে। কারণ তারা সঠিক তথ্য খুঁজতে গিয়ে বই ও লেখকের মনোভাব দ্বারা তাড়িত হয়। তাই অনেক সময় সঠিক তথ্য নিয়ে বিভ্রান্তিতে পড়ে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র : (মাথা নেড়ে সম্মতি জ্ঞাপন) জ্বি, আপনার অভিমতের সঙ্গে আমি সম্মতি জ্ঞাপন করছি। আমি নিজেই গবেষণা করতে গিয়ে দেখেছি যে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস প্রকাশের ক্ষেত্রে ভিন্নতা রয়েছে। বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হতে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে অনেক সময় মূল সত্যেও আঘাত করেছে, যা আমাদের জন্য সত্যিই একটি বিব্রতকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। এমন হবার কারণ কী বলে আপনি মনে করেন?

প্রবীণ মুক্তিযোদ্ধা : কারণ হিসেবে আমি মনে করি মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে রাজনৈতিক ক্ষমতার দ্বন্দ্ব এই ইতিহাসকে অনেক সময় বিকৃত করেছে। বিশেষ করে ১৫ আগস্টের পর বিভিন্ন সামরিক শাসকবর্গ মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে একটু হলেও ভিন্ন খাতে নেবার চেষ্টা করেছে। তারা সংবিধানের মৌলিক ও মূল বিষয়গুলোতে পরিবর্তন এনেছে। যা সঠিক ইতিহাসকে বিকৃতি করার জন্য অন্যতম কারণও বটে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র : (বিস্মিত হয়ে) তাহলে মুক্তিযুদ্ধের লেখকবর্গ ও মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী লেখকবর্গ কেন সঠিক তথ্য দিয়ে ইতিহাস লেখেননি? আমার জানা মতে অনেক সাহিত্যিক-ই মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং অনেকে প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। তাঁদের দায়বদ্ধতা থেকেও তো সঠিক ইতিহাস রচনা ও প্রকাশ করতে পারতেন।

প্রবীণ মুক্তিযোদ্ধা : হ্যাঁ, তা পারতেন কিন্তু রাজনৈতিক ঘূর্ণি বার্তায় তা হয়ে উঠেনি। বিশেষ করে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর হতেই ইতিহাস বিকৃত হতে থাকে। সামরিক জান্তাদের আনুকূল্য পাওয়ার জন্য অনেক লেখক ইতিহাস কে তাদের অনুকূলে নিয়ে গেছে। তারা সঠিক তথ্য জেনেও অনেক সময় রাজনৈতিক চাপে কিংবা পৃষ্ঠপোষকতার আশায় তা প্রকাশ থেকে বিরত থেকেছেন যা তোমাদের নতুন প্রজন্মের গবেষকদের দৃষ্টিতে ধরা পড়ছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র : আপনার অনুভূতি চমৎকার। কারণ মুক্তিযুদ্ধে চেতনাদীপ্ত হয়ে বর্তমানে যে সকল লেখক মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে গবেষণা করছে, তারা প্রায়ই এই আদর্শিক দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হচ্ছে। আমি নিজেই দেখেছি অনেক জায়গায় মুক্তিযুদ্ধে প্রকৃত ব্যক্তিবর্গের অবদান ছোট করে দেখা হয়েছে। আবার যারা সামান্য সম্মতি দিয়েছিল, তাদেরকে ফলাও করে সামনে এনে প্রচার করা হয়েছে।

প্রবীণ মুক্তিযোদ্ধা : তোমার ধারণা সঠিক, এদেশে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস একটাই কিন্তু তা থেকে ফায়দা নিতে চেয়েছে বিভিন্ন মহল ও শাসকগোষ্ঠী। যার কারণে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস ও ইতিকথাকে আড়াল করে নতুন তথ্য ও ইতিহাস সন্নিবেশ করা হয়েছে। তাই মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস অনুসন্ধানকারীদের কাছে এটি একটি বিভ্রান্তিকর অবস্থা। বিশেষ করে ক্ষমতা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাস ও সংবিধান পরিবর্তন হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র : আমি গবেষণায় একটি বিষয় বারবার অবলোকন করেছি। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক ও মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের শক্তি নিয়েও অনেক গ্রন্থে বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রদান করা হয়েছে। বিশেষ করে এই গ্রন্থগুলো ১৫ আগস্ট পরবর্তী লেখা।

প্রবীণ মুক্তিযোদ্ধা : মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস যদি তুমি অনুসন্ধান করো তাহলে দেখবে এই ইতিহাস তিনটি স্রোতে প্রবাহিত হয়েছে। বিশেষ করে স্বাধীনতাকালীন মুজিবনগর সরকারের আমল, শেখ মুজিবের শাসনামল ও তার হত্যাকাণ্ডের পরের সময়ের ইতিহাস। এভাবে তিনস্রোত তিনভাবে প্রবাহিত হয়েছে। কোথাও কোথাও মিলন ঘটেছে আবার কোথাও কোথাও ভিন্ন পথে গেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র : জ্বি, আপনার দৃষ্টিভঙ্গি আর আমার গবেষণার ফল একই। আমিও দেখেছি যে সামরিক শাসন আমলে বেশি পরিবর্তন সংযোজন করা হয়। (আক্ষেপ প্রকাশ) তবে লেখকবর্গ কেন সঠিক তথ্য প্রচার করেননি?

প্রবীণ মুক্তিযোদ্ধা : কারণ হিসেবে তুমি রাজনৈতিক চাপ ও মত প্রকাশের স্বাধীনতাহীনতাকেও দায়ী করতে পারো। কারণ সামরিক শাসন আমলে মানুষের বাক স্বাধীনতাকে আবার রুদ্ধ করে দেয়া হয়। আর সেই সময় যারা লেখালেখি করতেন অনেকে তা প্রকাশ করতে পারেননি। যারা প্রকাশ করেছেন তারা শাসক গোষ্ঠীর আনুকূল্য নিয়েই প্রকাশ করেছেন। তাই ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সঠিক ইতিহাস প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকতে হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র : আমি মনে করি এই সময়-ই ইতিহাস একটি ভিন্ন পথে প্রবাহিত হয়েছে। আমার অভিযোগ একটাই, যে ভয় স্বাধীনতাকে দমিয়ে রাখতে পারেনি, সেই ভয় কীভাবে সঠিক ইতিহাস রচনার পথে বাধা হয়।

প্রবীণ মুক্তিযোদ্ধা : হ্যাঁ, এটি একটি দুঃখজনক অধ্যায়ও বটে। অনেক মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস লেখা হলেও তা বিভিন্ন মত ও আদর্শকে ধারণ করে লেখা হয়েছে বিশেষ সুবিধা লাভের আশায়। তাই সত্য প্রকাশ থেকে অনেকে বিরত থেকেছে। কিন্তু আজ সময় এসেছে তোমাদের সঠিক তথ্য অনুসন্ধান ও প্রচার করার। তোমরাই পারো সঠিক একটি ইতিহাস পরবর্তী প্রজন্মকে উপহার দিতে। এ কাজ তোমাদের উপর আজ জাতি দিয়ে দিয়েছে। এ দায়বদ্ধতা তোমাদের ধারণ করতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র : জ্বি, আমরা সেই চেষ্টাই করছি। আপনাদের আদর্শকে অনুসরণ করে সঠিক ইতিহাস অনুসন্ধান করছি যাতে পরবর্তী প্রজন্ম তাদের অস্তিত্বের ইতিহাসে সংশয় না করে, তারা সঠিক বাংলাদেশের সঠিক ইতিহাস জানতে পারে।

প্রবীণ মুক্তিযোদ্ধা : হ্যাঁ, আমি বলবো জাতির বিবেক হিসেবে এটা তোমাদের কর্তব্য ও দায়িত্ব। আশা করি, তোমরা সঠিক ইতিহাস উপস্থাপন করে বাঙালি জাতির মুক্তিসংগ্রামের সঠিক ও অভিন্ন মতবিরোধহীন তথ্য উপহার দিবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র : আশীর্বাদ করবেন যেন তা করতে পারি। আপনাদের সংগ্রামের সঠিক ইতিহাস যেন পরবর্তী প্রজন্মের কাছে উপহার দিতে পারি। সময় দেবার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ও আপনার দীর্ঘায়ু কামনা করি।

প্রবীণ মুক্তিযোদ্ধা : তোমার গবেষণা ও অনুসন্ধানের জন্য তোমাকেও ধন্যবাদ। প্রয়োজন হলে আবার আলাপ হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র : জ্বি, আজ তাহলে আসি।

১৭। বিদেশে অবস্থানরত একজন শিক্ষার্থী এবং বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত একজন শিক্ষার্থীর মধ্যে চলমান বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে বিদেশি শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গতি-অসঙ্গতি নিয়ে একটি কাল্পনিক সংলাপ রচনা করুন।

উত্তর:

[বিদেশে অবস্থানরত একজন শিক্ষার্থী এবং বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত একজন শিক্ষার্থীর মধ্যে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে বিদেশি শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গতি-অসঙ্গতি নিয়ে সংলাপ]

[হোয়াটস অ্যাপে দুই বন্ধুর সাথে কথা হচ্ছে]

বাংলাদেশি : হ্যাঁলো, তুমি কেমন আছো? তোমার প্রবাস জীবন কেমন কাটছে?

বিদেশি : ভালো, তুমি কেমন আছো? বাংলাদেশের অবস্থা এখন কেমন?

বাংলাদেশি : বর্তমানে বাংলাদেশের অবস্থা স্থিতিশীল ও শান্তিপূর্ণ, তোমার লেখাপড়া কেমন চলছে?

বিদেশি : তুমি তো জানো যে, আমি ও আমার পরিবার এখানে নাগরিকত্ব লাভ করেছি অনেক আগেই। তাই এখানে কর্মজীবনের জন্য যে শিক্ষা প্রয়োজন সেই শিক্ষাই গ্রহণ করছি। তোমার পড়ালেখার খবর বলো?

বাংলাদেশি : এই তো মাস তিনেক হলো মাস্টার্স শেষ করেছি। এখন চাকরির পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছি যা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রচলিত প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বিদেশি : হ্যাঁ, আমি কিছুটা হলেও প্রাথমিক এই পদ্ধতি সম্পর্কে অবগত। কারণ আমার বাবার শিক্ষা লাভ বাংলাদেশে। কিন্তু এখানকার শিক্ষা ব্যবস্থা বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার বিপরীতমুখী।

বাংলাদেশি : বিদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা আমরা শুনেছি অনেকটা কারিগরি ও বাস্তবমুখী অর্থাৎ যোগ্যতা অনুযায়ী কর্ম।

বিদেশি : হ্যাঁ, তুমি যা শুনেছো তা অনেকটা ঠিক। কারণ এখানে শিক্ষা জীবন শুরুর পর থেকেই তার কর্মের পথ নির্ধারণ হয়ে যায় অর্থাৎ কর্ম ও শিক্ষা পরস্পর সংগতিপূর্ণ। কে কোন দিকে ক্যারিয়ার গড়বে তা শিক্ষাজীবন থেকেই নির্ধারিত হয়ে যায়?

বাংলাদেশি : (হতাশা প্রকাশ করে) কিন্তু দেখ, বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখানে শিক্ষাজীবন শেষ করার পর-ই তা নির্ধারিত তথা চাকরির পরীক্ষা দেবার মাধ্যমে কর্মপন্থা ও অবস্থান ঠিক করা হয়। তাই অনেক সময় শিক্ষা লাভের বিষয়ের সঙ্গে অসংগতি দেখা দেয়।

বিদেশি : হ্যাঁ, বাংলাদেশের সঙ্গে বিদেশি শিক্ষা ব্যবস্থার এখানেই বিরাট তফাত ও পদ্ধতিগত অমিল। শিক্ষাজীবন শেষ করে কেউ বিদেশে বসে থাকে না বিশেষ কারণ ছাড়া। কারণ এখানে শিক্ষা ব্যবস্থা অনেকটা কারিগরি যা কর্মের ক্ষেত্রে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

বাংলাদেশি : কিন্তু বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা বহুমুখী। এখানে সংবিধানে এক ও অভিন্ন শিক্ষা নীতির কথা বলা হলেও রয়েছে বিভিন্ন শিক্ষা পদ্ধতি ও লেভেল। তাই অনেক সময় দেখা যায় যে, যেকোনো ব্যক্তির পঠিত বিষয় থেকে তার কর্মক্ষেত্র সম্পূর্ণ বিপরীত। বাংলাদেশের শিক্ষাজীবনের লেখাপড়া আর চাকরি জীবনের পড়া লেখার মধ্যেও ভিন্নতা রয়েছে। যা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার অসঙ্গতি বলে আমি মনে করি। তোমাদের ক্ষেত্রে কেমন?

বিদেশি : আমাদের এখানে যা দেখেছি ও শিখেছি তা হলো তত্ত্বীয় পড়ালেখা অপেক্ষায় ব্যবহারিক পড়ালেখার দিকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। তাছাড়া এখানে যে শিক্ষানীতি গ্রহণ করা হয়েছে তা বাস্তবের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এক ও অভিন্ন নীতি চালু করা হয়েছে। যার কারণে কর্ম ও শিক্ষার দ্বন্দ্ব দেখা যায় না বললেই চলে।

বাংলাদেশি : (আক্ষেপ প্রকাশ করে) আর আমাদের শিক্ষানীতিতে বাস্তবতার সঙ্গেই অসঙ্গতি রয়েছে। এখানে বিভিন্ন স্তরের ও মাধ্যমের শিক্ষানীতি বিভিন্ন। তাই অভিন্ন শিক্ষানীতির অভাবে এখানে শিক্ষা ব্যবস্থাও ভিন্ন ভিন্ন। আবার অনেক সময় দেখা যায় যে, শিক্ষানীতিতে পাশ্চাত্যমুখী ধারা অবলম্বন করা হচ্ছে, আবার জাতীয় শিক্ষানীতির ধারাও অবলম্বন করা হচ্ছে। যার কারণে সংকরমুখী শিক্ষা চালু হয়ে গেছে। শিক্ষাজীবনের সিলেবাস এক রকম আর কর্ম জীবনের সিলেবাস আরেক রকম যা বিশ্বে কম পর্যবেক্ষণ করা যায়।

বিদেশি : হ্যাঁ, আমি তোমার সঙ্গে একমত। বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা অনেকটা অনুকরণধর্মী। যার ফলে নিজস্বতা হারিয়ে ফেলেছে। কিন্তু দেখ এখানে যে শিক্ষা ব্যবস্থা তা দেশের জাতীয় চাহিদা ও আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই পরিবর্তন ও সংযোজন করা হয়। কোন অনুকরণ কিংবা মত এখানে প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা নেই। ইতিহাস ও একই ধারায় চলে আসছে।

বাংলাদেশি : বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নত হলেও সমন্বয় এর অভাব-ই বড় সমস্যা। তাই অনেক সময়ই অসঙ্গতি দেখা যাচ্ছে। বিদেশি নীতি অনুকরণ করা হচ্ছে উন্নত বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার জন্য। কিন্তু সেভাবে উন্নত করা হচ্ছে না শিক্ষা জীবনের শিক্ষা ব্যবস্থাকে যা একটি বড় অসঙ্গতি বলে আমি মনে করি। তোমার কী মত?

বিদেশি : হ্যাঁ, আমিও এখানকার শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করে সেটাই জানতে পারছি। বাংলাদেশ আর এখানকার শিক্ষা ব্যবস্থা এক নয়, কিছুটা হলেও ভিন্ন।

বাংলাদেশি : আজ আর নয়, পরবর্তীতে আবার কথা হবে।

বিদেশি : শুভকামনা।

১৮। সাম্প্রদায়িকতা এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিষয়ে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের সংলাপ।

উত্তর:

[সাম্প্রদায়িকতা এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিষয়ে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের সংলাপ]

স্থান	:	বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ	সময়	:	বেলা ১১.০০ টা

শিক্ষক : বলো তো কিশোর, কোন বিষয়টি মানুষের জীবনের সুখ-শান্তি কেড়ে নিয়ে মানুষকে ধ্বংসের সাগরে ঠেলে দিচ্ছে?

ছাত্র : আমার মনে হয় বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ, স্যার।

শিক্ষক : প্রাকৃতিক দুর্যোগ নয়, কৃত্রিম দুর্যোগ। মানুষের তৈরি দুর্যোগ মানুষকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

ছাত্র : (অবাক হয়ে) মানুষের তৈরি কৃত্রিম দুর্যোগ কোনটি, স্যার?

শিক্ষক : মানুষের তৈরি কৃত্রিম দুর্যোগ হলো-সাম্প্রদায়িকতা। যার ফলে সৃষ্টি হয় মানুষে মানুষে হিংসা বিদ্বেষ, দ্বন্দ্ব সংঘাত।

ছাত্র : (উৎসুক দৃষ্টিতে) সাম্প্রদায়িকতা কী স্যার?

শিক্ষক : মানুষকে মানুষ হিসেবে বিবেচনা না করে ধর্ম, বর্ণ, জাতি, গোত্র ইত্যাদি দিয়ে পার্থক্য করে দেখা-ই সাম্প্রদায়িকতা। মোটকথা এক গোত্র, বর্ণ, জাতি বা ধর্মের ওপর অন্য গোত্র, বর্ণ, জাতি বা ধর্মের আধিপত্যের লড়াই।

ছাত্র : স্যার, কবে থেকে এই আধিপত্যের লড়াই শুরু হয়েছে?

শিক্ষক : যেদিন থেকে মানুষের উপর তার ধর্ম, বর্ণ, গোত্র বা জাতিকে প্রাধান্য দেওয়া শুরু হয়েছে, সেই দিন থেকেই এই লড়াইয়ের যাত্রা শুরু।

ছাত্র : স্যার, মানুষ কেন মানুষের উপরে ধর্মের প্রাধান্য দিতে শুরু করল?

শিক্ষক : কিছু কিছু মানুষের ধর্মীয় গোঁড়ামি এবং অন্ধ বিশ্বাসের কারণেই মানুষ মানুষের উপর ধর্মের, গোত্রের এবং বর্ণের প্রাধান্য দিতে শুরু করল।

ছাত্র : স্যার, ধর্মের জন্য মানুষ নাকি মানুষের জন্য ধর্ম?

শিক্ষক : অবশ্যই মানুষের জন্য ধর্ম। মানুষকে রক্ষা করাই ধর্মের কাজ। আর সেটা ভুলে যাওয়ার ফলেই আজ সাম্প্রদায়িকতা বিষবাষ্পের মতো ছড়িয়ে পড়েছে সারা পৃথিবীতে।

ছাত্র : স্যার, এই সাম্প্রদায়িকতা থেকে মুক্তির উপায় কী?

শিক্ষক : এই অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে হলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বাড়াতে হবে। অর্থাৎ ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে পৃথিবীর সকল মানুষকে এক এবং অভিন্ন জাতি মনে করতে হবে।

ছাত্র : স্যার, সাম্প্রদায়িকতা থেকে মুক্তির আরো কোন উপায় আছে, দয়া করে বলবেন?

শিক্ষক : হ্যাঁ। সাম্প্রদায়িকতা থেকে উত্তরণ ঘটাতে হলে আমাদের প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে। ধর্ম সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করতে হবে। শোনা কথা বা ভাসা ভাসা জ্ঞান নিয়ে তর্কে লিপ্ত হওয়া যাবে না। 'সবার উপরে মানুষ সত্য' মানবতার এ অমর বাণী সবার অন্তরে গেঁথে দিতে হবে। মানুষকে মানুষ হিসেবে মূল্যায়ন করতে হবে। তাহলেই আমাদের দেশ তথা সারা বিশ্বে সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত সুন্দর সমাজ গঠিত হবে।

ছাত্র : স্যার, আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।

শিক্ষক : তোমাকেও ধন্যবাদ।

১৯। মনে করুন, আপনি রাসেল। আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। আপনি আপনার শিক্ষকের সাথে সর্বস্তরে মাতৃভাষার প্রয়োগ বিষয়ে সংলাপ লিখুন।

উত্তর:

[রাসেল ও শিক্ষকের মধ্যে সর্বস্তরে মাতৃভাষার প্রয়োগ বিষয়ে সংলাপ]

স্থান	:	বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ	সময়	:	সকাল ১০.০০ টা

রাসেল : (নম্র স্বরে) আসসালামু আলাইকুম, স্যার।

শিক্ষক : ওয়ালাইকুম আসসালাম।

রাসেল : স্যার, আমি একটা বিষয় নিয়ে খুব ভাবছি। সেই বিষয়টা কি আপনার সাথে আলোচনা করতে পারি?

শিক্ষক : হ্যাঁ, অবশ্যই রাসেল। তুমি আমাকে বলতে পারো।

রাসেল : স্যার, আপনি কি মনে করেন আমাদের মাতৃভাষা বাংলাকে বর্তমানে যথাযোগ্য মর্যাদায় স্থান দেয়া হয়েছে?

শিক্ষক : দেখ রাসেল, মাতৃভাষাকে যেভাবে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে মর্যাদা দেওয়া হয়, সে তুলনায় আমাদের দেশে মাতৃভাষার মর্যাদা বা সম্মান খুব সামান্যই দেয়া হয়। (হতাশ ভঙ্গিতে) আমাদের ভাষা প্রেম ঐ ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্তই সীমাবদ্ধ।

রাসেল : স্যার, এমন অবহেলা করা হচ্ছে কেন?

শিক্ষক : এর জন্য দায়ী আমাদের মানসিকতা। আমরা বাংলা ভাষাকে ইংরেজি ভাষার চেয়ে কম দাম দেই। যার ফলে এই অবস্থা। এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্ব পেতে পেতে হয়ত বাংলা ভাষার গুরুত্বই কেউ একদিন দিবে না।

রাসেল : (কৌতূহল প্রকাশ) স্যার, এ অবস্থা থেকে উত্তরণের কোনো উপায় আছে?

শিক্ষক : হ্যাঁ, আছে। তবে সবকিছুর মূলকথা বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিকের মধ্যে মাতৃভাষার প্রতি আলাদা সম্মান করার মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে। তারপর নিজ পরিবারের সদস্যদের প্রতি তা আরোপ করতে হবে। যদি একটি প্রজন্ম ঠিকভাবে বাংলা ভাষাকে আঁকড়ে ধরে, তাহলে তা অন্য প্রজন্মেও প্রসারিত হবে। তাছাড়া রাষ্ট্রের দায়িত্ব তো থেকেই যায়।

রাসেল : স্যার, রাষ্ট্র এ বিষয়ে কী দায়িত্ব পালন করতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

শিক্ষক : রাষ্ট্রই সব ক্ষেত্রে বাংলা ভাষা বাধ্যতামূলক করতে পারে। বর্তমানে অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে বাংলা বিষয় বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে না। অর্থাৎ যে দেশের মাতৃভাষা বাংলা সেই দেশে যদি মাতৃভাষা এমনভাবে অবহেলিত হয়, তাহলে সরকার বা রাষ্ট্রের ব্যবস্থা নেওয়া ছাড়া অন্য কোনো উপায় থাকতে পারে না।

রাসেল : আপনাকে ধন্যবাদ, স্যার।

শিক্ষক : তোমাকেও ধন্যবাদ, রাসেল।

২০। **সংস্কৃতি ও অপ-সংস্কৃতি নিয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে একটি কাল্পনিক সংলাপ রচনা করুন।**

উত্তর:

[সংস্কৃতি ও অপ-সংস্কৃতি নিয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে একটি কাল্পনিক সংলাপ]

স্থান	:	শহরের পার্ক	সময়	:	বিকাল ৪.০০ টা

শোয়েব : জাহিদ, তোমাকে বেশ উত্তেজিত মনে হচ্ছে। কোনো কিছু ঘটেছে কী? এই সময়ে এই গাছের নিচেই বা কী করো?

জাহিদ : আসলে শোয়েব, আমার বাবা আমাকে আজ সকাল থেকে বার বার বলেই চলছে যে, আমি অপসংস্কৃতির প্রভাবে পড়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছি, আমার আচরণ খারাপ হয়ে যাচ্ছে। তাই রেগে এখানে বসে আছি।

শোয়েব : তোমার এভাবে রেগে যাওয়া ঠিক হচ্ছে না, জাহিদ। আমরা বর্তমানের প্রজন্ম প্রত্যেকেই কোনো না কোনো সংস্কৃতি বা অপসংস্কৃতি দিয়ে প্রভাবিত হচ্ছি।

জাহিদ : (বিরক্তি প্রকাশ করে) অপসংস্কৃতি বলে চেঁচানো আমাদের একটা ম্যানিয়া হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শোয়েব : 'অপ' শব্দের অর্থ খারাপ। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে খারাপ কিছু দেখলে অপসংস্কৃতি বলা তো অন্যায় নয়, দোষেরও নয়।

জাহিদ : দেখ, শোয়েব, আমরা বড় বেশি রক্ষণশীল। প্রচলিত পুরোনো পথে হাঁটতে আমরা অভ্যস্ত। তার একটু ব্যতিক্রম হলেই বা তাতে একটু নতুনত্ব এলেই আমাদের গেল গেল রব। হিন্দি সিনেমার গান, পশ্চিমা রক-পপের অনুপ্রবেশ মাত্রই আমরা সর্বনাশের কারণ বলে ভয়ে সিটিয়ে থাকি। অপসংস্কৃতি বলে চেঁচিয়ে দেশ মাতিয়ে তুলি।

শোয়েব : (উদ্বিগ্ন হয়ে) ওভাবে ভাবছো কেন?

জাহিদ : কীভাবে ভাববো বলো।

শোয়েব : আগে সংস্কৃতি-অপসংস্কৃতির বোধটা পরিষ্কার করে নিই।

জাহিদ : তাই হোক।

শোয়েব : শিক্ষা-দীক্ষা, গান, নাচ, নাটক এসবের একটা সাধারণ নাম হলো সংস্কৃতি। একেই ইংরেজিতে বলা হয় কালচার। কেউ বা কালচারের প্রতিশব্দ কৃষ্টি বলেন।

জাহিদ : বুঝলাম। তারপর?

শোয়েব : এখন দেখতে হবে সংস্কৃতির ধারক ও বাহক কী?

জাহিদ : সংবাদপত্র, বই, সিনেমা, টেলিভিশন, বেতার, ভিডিও, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি।

শোয়েব : এগুলোই হলো এক অর্থে সংস্কৃতির উপকরণ। এদের ব্যবহারের ও পরিবেশনের দায় দায়িত্ব অপরিসীম। এরাই মানুষকে শিক্ষা দেয়, মানবিক মূল্যবোধ গড়ে তোলে, দেশাত্মবোধের উদ্ভব ঘটায়, পারস্পরিক মমত্ব-সহানুভূতি-সহমর্মিতার বোধ জাগায়, প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসার বিকাশ ঘটায়।

জাহিদ : বুঝেছি, একেই বলে সুস্থ সংস্কৃতি।

শোয়েব : ঠিক ধরেছো। বিপরীত হলেই অপসংস্কৃতি। অপসংস্কৃতি মানুষকে বিকৃত রুচির পথে ঠেলে দেয়, অবক্ষয়ের পথে চালিত করে, মানুষের মহৎ ভাবনা-চিন্তার লোপ ঘটায়, মানুষের প্রতি মানুষের দায়-দায়িত্ব কর্তব্যবোধ ধ্বংস করে, ঘৃণায় বিদ্বেষে-জিঘাংসায় অমানুষ করে তোলে। তাকে মানুষের শুভবোধের পরিচয় বলবে? তাকে সংস্কৃতি, না অপসংস্কৃতি বলবে?

জাহিদ : তা না হয় হলো। কিন্তু পশ্চিমা ঝড়ের তাণ্ডবে ঘরের যাবতীয় জিনিসপত্র লন্ডভন্ড করে দেয় বলে কী সারা বছর ঘরের দরজা-জানালা রুদ্ধই থাকবে? বাইরের আলো হাওয়ার অবাধ চলাচলের পথ না থাকলে ঘরের মানুষটা বাঁচবে কী করে?

শোয়েব : না, প্রবেশের সুযোগ অবশ্যই থাকবে। তবে অবাঞ্ছিতকে বর্জন করে কেবল বাঞ্ছিতটুকু নেবার যথার্থ গ্রহণ-ক্ষমতা ও সেই নির্বাচনি মানসিক দৃঢ়তা থাকা দরকার। দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে–এই উদার সমন্বয়ী মনোভাবের মধ্য দিয়েই তো জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য সংস্কৃতি সব কিছুরই উৎকর্ষ সম্ভব।

জাহিদ : তোমার কথায় আমি সংস্কৃতি ও অপসংস্কৃতি বিষয়ে মূল্যবান ও প্রয়োজনীয় অনেক কিছু বুঝতে ও শিখতে পারলাম। ধন্যবাদ, শোয়েব।

শোয়েব : তোমাকেও অসংখ্য ধন্যবাদ, জাহিদ। এখন মাথা ঠান্ডা করে বাড়ি চলে যাও। বিকেলে মাঠে দেখা হবে।

জাহিদ : ওকে, বিদায়।

২১। **সামাজিক অস্থিরতা নিয়ে বন্ধুদের সংলাপ।**

উত্তর:

[রাশিদুল: একজন তরুণ সাংবাদিক; খুশি: একজন সমাজকর্মী; জহুরুল: সাধারণ নাগরিক। একটি ক্যাফেতে একত্রিত হয়ে এই তিন বন্ধু সামাজিক অস্থিরতা নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিল]

স্থান	:	শহরের অভিজাত ক্যাফে	সময়	:	বিকাল ৫.০০ টা

রাশিদুল : (কফির কাপে চুমুক দিয়ে) পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে যেয়ে গত কয়েক মাস ধরে লক্ষ করছি দেশটা যেন একটা ফুটন্ত কড়াই। একের পর এক নেতিবাচক বিষয় মানুষের মনকে বিষিয়ে দিচ্ছে।

খুশি : (দীর্ঘশ্বাস ফেলে) খেয়াল করেছো কী না এই নেতিবাচক ঘটনাগুলোর উল্লেখযোগ্য নারী ও শিশু নির্যাতন ও নিপীড়ন সংক্রান্ত। পত্রিকার পাতা বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে চোখ রাখলে এই সংক্রান্ত খবরগুলোই বেশি ।

রাশিদুল : (দুঃখিত হয়ে) আমিও বিষয়টা লক্ষ্য করেছি

জহুরুল : (হতাশ হয়ে) দেখো অভ্যুত্থানের সময় আমরা ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ নির্বিশেষে সবাই ঐক্যবদ্ধ ছিলাম। কিন্তু এখন কেউ ধর্মের নামে, কেউ লিঙ্গের ভিত্তিতে আলাদা হয়ে যাচ্ছি, সর্বত্র বিভাজিত হচ্ছি।

রাশিদুল : তোমার সাথে একমত। সবাই যেন নিজের মতামত চাপিয়ে দিতে চাইছে, আর কেউ কারও কথা শুনতে রাজি না।

খুশি : দেশে ধর্মের নামে তৌহিদি জনতার মোরাল পুলিশিং নারীদের ও অন্য ধর্মের মানুষের জন্য সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

জহুরুল : এই সামাজিক অস্থিরতার কারণ কী বলে তোমাদের মনে হয়?

রাশিদুল : এর পেছনে অনেকগুলো অনুঘটক রয়েছে। যেমন: পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন শিথিল হওয়া, অর্থনৈতিক অসাম্য, রাজনৈতিক অস্থিরতা, শিক্ষার অভাব, মাদকের বিস্তার, কর্মহীনতা, নৈতিকতার অভাব, প্রযুক্তির অভিশাপ ইত্যাদি।

খুশি : এছাড়া আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর নিষ্ক্রিয়তার সুযোগ নিচ্ছে সংঘবদ্ধ অপরাধী চক্রগুলো। দিনদুপুরে ঘটছে ছিনতাই ও নারী হেনস্তার ঘটনা। পত্রিকায় যতটুকু আসে, মূল ঘটনা তার চেয়েও ভয়াবহ।

জহুরুল : এই অস্থিরতা দূরীকরণে রাষ্ট্র, সমাজ ও নাগরিকদের করণীয় কী কী?

রাশিদুল : বিচারের দীর্ঘসুত্রতার কারণে নারী ও শিশু নিপীড়ক পার পেয়ে যায়। আর আমাদের সমাজব্যবস্থায় এখনো ভুক্তভোগীকে দোষারোপ করার সংস্কৃতি বিদ্যমান। তাই বৃহৎ জনগোষ্ঠী নিপীড়নের শিকার হওয়া সত্ত্বেও বিচার চান না।

খুশি : শুধু আইন পরিবর্তন করে ঘটনাগুলোর পুনরাবৃত্তি রোধ করা যাবে না, মানসিকতারও পরিবর্তন ঘটাতে হবে। এক্ষেত্রে পরিবারে নীতি নৈতিকতার চর্চা অপরিহার্য।

জহুরুল : আমরা শুধু আমাদের বিশ্বাসকেই জয়ী করতে চাই, এই মানসিকতা থেকেও আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে।

রাশিদুল : সামাজিক অস্থিরতা রোধে আমরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে ইতিবাচকভাবে ব্যবহার করতে পারি। "শুনুন, বুঝুন, তারপর কথা বলুন।" আমরা এই রকম প্রচরণা শুরু করতে পারি।

খুশি : এটা একটা ভালো উদ্যোগ। ছোট প্রচারণাও বড় পরিবর্তন আনতে সক্ষম।

জহুরুল : (হঠাৎ ফোন বেজে উঠে) আমার একটু উঠতে হবে।

রাশিদুল : চলো আমরাও উঠি। পরে আবার আরেকদিন আড্ডা দেওয়া যাবে।

[এরপর কফির দাম মিটিয়ে তিন বন্ধুর ক্যাফে ত্যাগ]